চাঁদমামা
জানুয়ারী ১৯৭৩
৭০
P

Photo by: PREM SHARMA

পেটের গোলমাল?
সে আবার কি বাপু?
কোনদিন শুনিনিতো!
ডাবর
গ্রাইপ
ওয়াটার
প্রত্যেক মায়ের কাছে
তার শিশুর মতন প্রিয়
শিশুদের বদহজম, অম্বল,
পেটব্যাথা, বায়ু, ও দাঁতউঠার
সময় ব্যাথার
একটি সুস্বাদু
সুনিশ্চিত
সমাধান
GRIPE
WATER
ডাবর (ডাঃ এস. কে. বর্ম্মন) প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা-২৯

রসেভরা...মনেরমত...মজাদার
মাত্র ২৫ পয়সা!
PARLE POPPINS FRUITY SWEETS
নতুন পার্লে
পপিন্স
ফলের স্বাদেভরা লজেন্স
লেবু, জামীর, কমলালেবু, আনারস আর র‍্যাম্পবেরী—এই ৫টি ফলের স্বাদে ভরপুর কমদামের সুন্দর সুন্দর প্যাকে খুব সুস্বাদু ১৩ টি লজেন্স পাওয়া যাচ্ছে।
৫টি ফলের মজা পাবেন, পপিন্স যখনই খাবেন
everest/122d/PP1ben

চাঁদমামা
সংস্থাপক ঃ বি. নাগি রেড্ডি
নিয়ন্ত্রণ ঃ চক্রপাণি
সৎ এবং নিষ্ঠাবান মাত্রেই পরিশ্রম করে সাধনার মাধ্যমে প্রতিভাধর হতে চায়। কেউ তাকে রাতারাতি বিরাট ক্ষমতাবান করে তুললে, তাতে সে তৃপ্তি বা শান্তি পায় না। এই ধরণের একজন সাধকের কাহিনী 'সাধনা'।
ভাল শাসকের পতন ঘটাতে কত রকমের চক্রান্ত যে করতে হয় তার কাহিনী আছে এবারের 'শিবপুরাণে।'
'অসভ্য' কাহিনী সেকালের হয়েও যেন একালের। এই ভাবে আরো আছে : নেকড়ে, ফসল, চালবাজ, রানী-দাসী, শ্রমের ফল প্রভৃতি।
এছাড়া এক দিনের রাজা, যক্ষপর্বত এবং মহাভারত তো আছেই।
খণ্ড ১ জানুয়ারী ১৯৭৩ সংখ্যা ৭

শত নিষ্কো ধনাঢ্যশ্চ,
শত গ্রামেণ ভূপতিঃ,
শতাশ্বঃ ক্ষত্রিয়ো রাজা,
শত শ্লোকেন পণ্ডিতঃ। ॥ ১ ॥

[শত স্বর্ণমুদ্রার যে অধিকারী সেই ধনী, শত গ্রামের অধিপতিই ভূপাল, শত ঘোড়ার রক্ষকই ক্ষত্রিয়, শত শ্লোক যার জানা আছে সেই পণ্ডিত।]

শকটম্ পঞ্চ হস্তেষু,
দশ হস্তেষু বাজিনম্,
গজম্ হস্ত সহস্রেষু,
দুর্জনম্ দূরতঃ ত্যজেৎ। ॥ ২ ॥

[গাড়ি থেকে পাঁচ হাত দূরে, ঘোড়া থেকে দশ হাত দূরে, হাতী থেকে হাজার হাত দূরে এবং দুর্জন থেকে দূরেই থাকতে হয়।]

কৃষিতো নাস্তি দুর্ভিক্ষম্,
জপতো নাস্তি পাতকম্,
মৌনেন কলহো নাস্তি,
নাস্তি জাগরতো ভয়ম্। ॥ ৩ ॥

[যে ক্ষেতের কাজ করে তার আকালের ভয় থাকে না, যে জপ করে তাকে পাপ ছোঁয় না, যে মৌন থাকে তার কলহের ভয় থাকে না, একই ভাবে যে জেগে থাকে তার কোন ভয় থাকে না।]

নেকড়ে

ফ্রান্সে এখন যেখানে বিরাট উদ্যান রয়েছে সেখানে হাজার বছর আগে ছিল এক অরণ্য। সেই অরণ্য জ্বলে পুড়ে যাওয়ার বিষয়ে এক লোককথা আছে। ঐ কাহিনী হল নিম্নরূপ :

সেই অরণ্যের এক প্রান্তে গরীব কিষাণ বাস করত। একদিন কিষাণ শহরে দুটো বড় রুটি কিনে ফিরছিল। পথে হঠাৎ সামনে এক নেকড়েকে দেখল। নেকড়েটা কিষাণকে দেখে গর্জন করতে থাকে। নেকড়ের ভয়ঙ্কর রূপ দেখে কিষাণ ভয় পায়।

ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে কিষাণ ভেবে পাচ্ছিলনা কি করবে। পালানো অসম্ভব আর নেকড়েকে মোকাবিলা করাও তার পক্ষে সম্ভব নয়। কিষাণ কি যেন ভেবে নেকড়েকে বলল, "নেকড়ে ভায়া, তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তোমার খিদে পেয়েছে। এই রুটির টুকরোটা খাও ভাই।" কিষাণ এক টুকরো নেকড়ের দিকে ছুঁড়ে দিল। নেকড়ে খুশী হয়ে তা খেল। সুযোগ বুঝে কিষাণ বাড়ির দিকে পা বাড়াল।

অনেক দূরে যাওয়ার পর কিষাণ পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখে নেকড়েও তার পেছনে পেছনে আসছে। সে বলল, "নেকড়ে ভায়া, তুমি সত্যিই ভাল। আর এক টুকরো খাবে? খাও।" কিষাণ আর এক টুকরো ছিঁড়ে নেকড়ের দিকে ছুঁড়ে দিল।

কিন্তু তাতেও নেকড়ে তার পিছু ছাড়ল না। সারাপথ সে একটা একটা করে টুকরো দিতে থাকে আর নেকড়ে তা খেতে থাকে।

পা চালিয়ে হাঁটতে হাঁটতে শেষে কিষাণ বাড়ি পৌঁছাল। তখন তার হাতে ছিল একটি রুটির টুকরো। নেকড়েও কিষাণের

ফরাসী লোককথা

ঘরের কাছে পৌঁছাল।

কিষাণের স্ত্রী জিজ্ঞেস করলো, "রুটি কোথায় ? রুটির সাথে খাব বলে পায়েস তৈরী করে রেখেছি।"

কিষাণ তাড়াতাড়ি হাঁটার ফলে হাপাঁ-চ্ছিল। কোন কথা না বলে নেকড়ের দিকে তর্জনী দেখাল।

"ওমা এযে নেকড়ে ! তাই বুঝি তুমি হাঁপাচ্ছ ! কি ভাগ্যি তুমি এখনো নেকড়ের পেটে যাওনি !" কিষাণের বউ বলল।

আমি যে রুটি দুটো কিনেছিলাম তা একটু একটু করে নেকড়েকে সারা পথ ধরে খেতে দিয়েছি।

"এই হারামজাদা নেকড়ে রুটিগুলো সব খেল ! তুমি তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দাও। ওদিকে তাকাতেই আমার ভয় করছে।" কিষাণের বউ বলল।

কিষাণ দরজা বন্ধ করার আগে হাতে যে রুটির টুকরোটা ছিল সেটাও নেকড়ের দিকে ছুঁড়ে বলল, "নাও এটাও তুমি খেয়ে নাও।" তারপর দরজা বন্ধ করে দিল।

নেকড়ে রুটির টুকরোটা খেয়ে অনেকক্ষণ ঐ দরজার কাছে বসেছিল। ঘরের ভেতর ঐ কিষাণ পত্নী ঐ পায়েস টুকু খেয়ে নিল। খেতে বসে কিষাণ-বউ নেকড়েকে অনেক গালাগাল দিল। ঐ কথাগুলো নেকড়ে শুনল। ওদের খাওয়া শেষ হতেই নেকড়ে চলে গেল।

এই ঘটনার অনেক দিন পরে কিষাণ দম্পতি অনেক পরিশ্রম করে যে সামান্য কিছু অর্থ জমিয়ে ছিল তা দিয়ে একটি গরু কিনবে ঠিক করলো। কিষাণ সেই টাকা নিয়ে গরু কিনতে হাটে গেল। অল্প টাকা নিয়ে কিনতে হবে। বড় গরু তো পাবে না। তাই যাচাই করতে করতে ঘোরাঘুরি করছিল। একটা লম্বা লোক কিষাণের কাছে এসে বলল "তুমি গরু কিনতে চাও ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ তবে আমার কাছে তো

বেশী টাকা নেই তাই যাচাই করে কেনার জন্য নানান জায়গায় ঘুরছি।" কিষাণ বলল।

"আমার কুটিরে কতকগুলো গরু আছে তার মধ্যে কোনটা যদি তোমার পছন্দ হয়, নিতে পার।" ঐ লম্বা লোকটা এগিয়ে এসে বলল।

দুজনে একসঙ্গে বাড়ির কাছে গেল। বাড়ির পেছনের গোয়ালে ঢুকে লম্বা লোকটা বলল, "এর মধ্যে সবচেয়ে যেটা ভাল সেটা তুমি নিতে পার।"

কিষাণ অবাক হয়ে গেল। এ যেন এক বিরাট সুযোগ তার সামনে এসে গেল। সে একটি গরু বাছাই করে নিল। লম্বা লোকটা গরুর গলায় দড়ি বেঁধে তার হাতে দিতে দিতে বলল, "তুমি দেখছি আমার যতগুলো গরু আছে তার মধ্যে সবচেয়ে ভাল গরুটাই নিলে।"

তারপর ঐ লম্বা লোকটা পকেট থেকে একটি কৌটা বের করে কিষাণকে বলল, "এই কৌটা তুমি তোমার বউকে আমার পক্ষ থেকে উপহার দেবে। একান্তে তোমার বউ যেন এই কৌটোটা খোলে। অন্য কারও সামনে খুলতে তোমার বউকে অবশ্যই বারণ করো।"

কিষাণ কৌটোটা নিতে নিতে বলল, "আপনি কেন যে আমার প্রতি দয়ালু হয়েছেন, এত উপকার করছেন, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।"

লম্বা লোকটা হেসে বলল, "তুমি
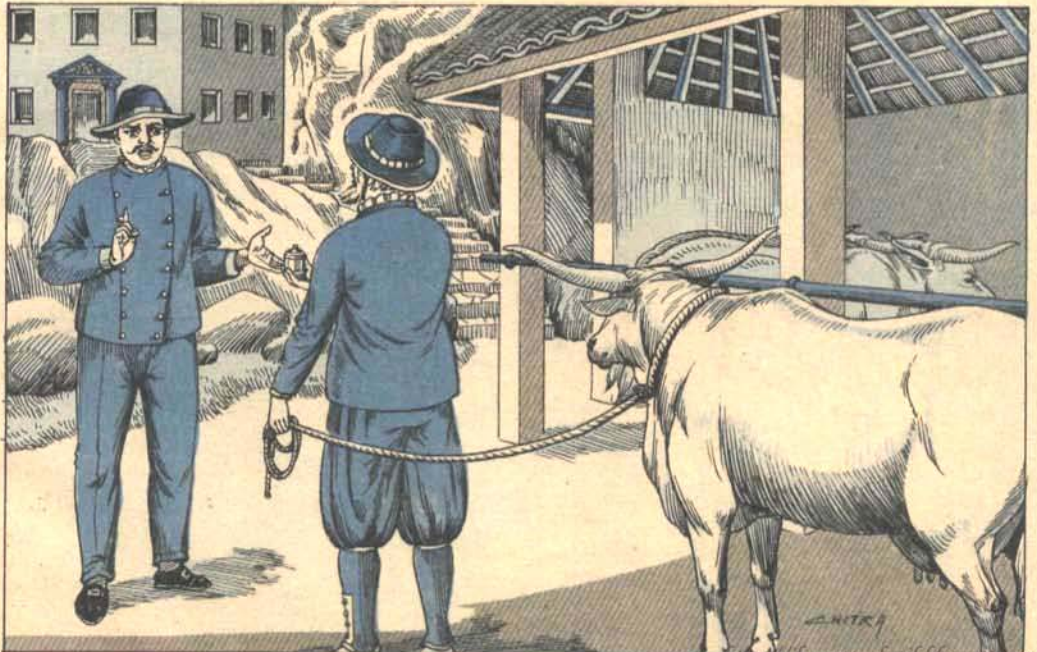
একদিন আমার প্রতি দয়ালু হয়ে দুটো রুটি খেতে দিয়েছিলে, আমি-ই সেই নেকড়ে। আমি ভালর কাছে ভাল, মন্দের কাছে মন্দ। যারা আমার অপকার করে, আমাকে খারাপ কথা বলে, তাদের আমি সময় মত শিক্ষা দিয়ে থাকি। আচ্ছা, এবার তাহলে এস। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুক।"

এ কথা শুনে কিষাণ অবাক হল এবং খুশী হল। তারপর সে কৌটো আর গরু নিয়ে অন্য কোন দিকে না গিয়ে বাড়ির পথ ধরল।

ঐ কৌটোতে যে কি আছে তা জানার কৌতূহল কিষাণকে পেয়ে বসল। লম্বা লোকটা যেহেতু তার বউকে ঐ কৌটা একান্তে খুলতে বলল, সেই হেতু সন্দেহ ও কৌতূহল প্রবলতর হল। কৌটোটা নাড়ল, কোন শব্দ নেই। শুঁকল, কোন গন্ধ নেই। বাড়ি ফেরা পর্যন্ত নিজের কৌতূহল আর চেপে রাখতে পারল না। গরুটাকে চরতে ছেড়ে নিজে একটি গাছের নিচে বসে কৌটোটা খুলল। খুলেই হাত থেকে ফেলে দিয়ে কিষাণ যেন ছিটকে গেল। কারণ কৌটোটা খুলতেই তা থেকে আগুনের ফোয়ারা ছুটে, সেই জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ড সোজা উপরে উঠে গেল গাছে। গাছে আগুন ধরে গেল।

"বাপরে! কি কাণ্ডই না হত। বউ একান্তে খুললে তার মুখ চুল সব পুড়ে ছাই হয়ে যেত। সেদিন রাত্রে আমার বউ যে নেকড়েটাকে গালাগাল দিয়েছিল তারই বদলা নিতে লম্বা লোকটা আমার বউকে এই কৌটো দিয়েছে!" কিষাণ বিড় বিড় করে বলল।

একটার পর একটা গাছে আগুন লাগছিল। কিষাণ গরুটাকে নিয়ে নিজের বাড়ির দিকে তাড়াতাড়ি পা চালাল। সমস্ত অরণ্যে সেই আগুন ছড়িয়ে পড়ল। গাছগুলো ঐ দাবানলের আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেল।

কিষাণ দম্পতি ঐ গরুটার জন্য বহু-দিন সুখে ছিল।

ফসল
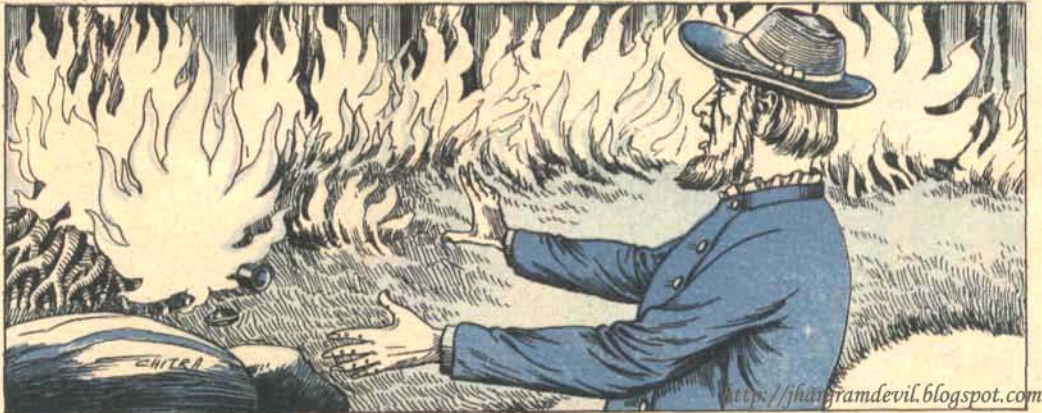
কৃষ্ণদাস ও আবুল দুই বন্ধু। ওরা দুজনে রামপুর গ্রামে এক বাগান কিনেছিল।

কৃষ্ণদাস চাষের কাজ ভাল জানত না। ভাল মন্দর সব কিছুর ভার ভগবানের ওপর চাপিয়ে দিয়ে হাত গুটিয়ে সে দিনের পর দিন বসে থাকত।

আবুল খেত খামারের কাজ খুব ভাল জানত। সারাদিন কাজ করত। ঘাস উপড়ানো, চারা গাছ পোতা, প্রত্যেকটা গাছ জল পাচ্ছে কিনা লক্ষ্য রাখা প্রভৃতি কাজে ব্যস্ত থাকত।

সে বছর ফসল খুব ভাল হয়। ফসল বিক্রী করে ওরা ভাল টাকা পায়। তার-পর সমস্যা দেখা দিল টাকাটা কিভাবে ভাগ করবে তা নিয়ে। সমান ভাগ হোক এটা দুজনের মধ্যে কেউ চায় না।

"আমি সারাদিন খেটেছি, আমার তো বেশী পাওয়া উচিত।" আবুল বলল।

"আমি দিনরাত ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছি, আমার ওপর খুশী হয়ে ভগবান বেশী ফসল দিয়েছেন। অতএব আমারই বেশী পাওয়া উচিত।" কৃষ্ণদাস জোর দিয়ে বলল।

দুজনে কথা কাটাকাটি করে শেষে গেল গ্রামের মাতব্বরের কাছে। মাতব্বর দুজনের কথা শুনে বলল, "আমি তোমা-দের দুজনকে একটা ছোট্ট কাজ দিচ্ছি। আজ রাত্রের মধ্যে সেই কাজ করে কাল সকালে আমার সাথে দেখা কর। তখন তোমাদের বিচার করব।"

দুজনকে দু বস্তা করে ধান দিয়ে মাতব্বর বলল, "এই ধান ভেঙ্গে কাল আমার কাছে নিয়ে এস।"

দু বস্তা করে নিয়ে কৃষ্ণদাস ও আবুল যে যার বাড়ী ফিরে গেল।

কৃষ্ণদাস ধান ভাঙ্গার ভার ভগবানের

রবীন্দ্র ভট্টাচার্য

ওপর চাপিয়ে, ভগবানের প্রার্থনা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়ল।

আবুল সারারাত ধরে মাত্র এক বস্তা ধান ভাঙ্গতে পারল।

মাঝরাতে মাতব্বর দুজনেরই ঘরের কাছে ঘোরাঘুরি করে আবুলের ঘর থেকে ধান ভাঙ্গার শব্দ শুনলো কিন্তু কৃষ্ণদাসের ঘর থেকে কোন আওয়াজ পেল না।

পরের দিন কৃষ্ণদাস এবং আবুল ঐ বস্তাগুলো নিয়ে মাতব্বরের কাছে এল। মাতব্বর কৃষ্ণদাসের বস্তা খুলে দেখে একটিও চালের কণা নেই। কৃষ্ণদাস ভেবেছিল ভগবান সব ধান চাল করে দিয়েছে। কিন্তু বস্তা খোলার পর যা দেখল তাতে সে অবাক হল। সে ভেবেছিল সমস্ত ধান ভগবান চাল করে দেবে। কিন্তু বস্তায় ছিল শুধু ধান।

আবুল যে বস্তা দুটো নিয়ে এল তার মধ্যে একটিতে চাল অন্যটিতে ধান ছিল।

"কৃষ্ণদাস, দেখলে তো? পরিশ্রম ছাড়া ফল পাওয়া যায় না। তুমি ভগবানের উপর শুধু নির্ভর করেছিলে। তার ফলে তুমি তাঁর অনুগ্রহ পাওনি। ভগবান তোমাকে অনুগ্রহ যদি করতেন তিনি তোমাকে খাটাতেন, ধানগুলো চাল হত। ক্ষেতে যে ফসল হয়েছে তা আবুলের পরিশ্রমের ফলে হয়েছে। তুমিও আবুলের সাথে পরিশ্রম করলে আরও অনেক বেশী ফসল ফলত। বেশী রোজগার হত। যা হওয়ার হয়ে গেছে। ভবিষ্যতে তোমরা দুজনে এক সাথে কাজ করে আরও বেশী ফলাও আর যা পাবে তা দুজনে সমান ভাবে ভাগ করে নাও।" মাতব্বর বলল।

তারপর থেকে কৃষ্ণদাস আবুলের সাথে কাজ করত। ভাগ বাটোয়ারা নিয়ে ঐ দুই বন্ধুর মধ্যে কোন দিন বিবাদ হয়নি।

যক্ষপর্বত

ছয়

[লোমশ-ভূতটাকে দেখেই লুণ্ঠনকারীরা পালাল। তাদের মধ্যে কয়েকজন যব আর গমের বস্তাগুলো নদীতে ফেলে দিল। খড়্গবর্মা ও জীবদত্ত ঐ গুহার দিকে এগোতেই লোমশ-ভূত যে কথা চিৎকার করে বলল সেই কথা শুনে তান্ত্রিক মশাল ছুঁড়ে ঐ দুজনকে ভস্ম করার কথা ঘোষণা করে গুহার ভিতরে ঢুকে যায়। তারপর...]

জীবদত্ত ভাবছে, গুহার ভিতর ঢুকে তান্ত্রিকের ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে না অন্য কি ভাবে কি করবে।

খড়্গবর্মা সন্দেহ ও আশঙ্কা ভরা চোখে গুহার দিকে তাকিয়ে জীবদত্তকে বলল, "জীবদত্ত, মনে হচ্ছে তোমার পোশাক দেখে তান্ত্রিক একটু ঘাবড়ে গেছে। সে হয়ত তোমাকেও একজন তান্ত্রিক ভেবেছে। তাই সে তাড়াতাড়ি গুহার ভিতর ঢুকে গেছে! এখন কী করবে ভাবছ?"

জীবদত্ত দেখতে পেল ঐ লোমশ-ভূত গণ্ডকজাতের লোকের হাতে আক্রান্ত হওয়ার ভয়ে এধার-ওধার ছোটা-ছুটি করছে।

জীবদত্ত বলল, "আমি এই জন্যই মাথার চুল গোল করে বেঁধে হাতে মন্ত্রদণ্ড নিয়েছি। ওরা আমার রূপসজ্জা দেখে

যাতে ভাবে যে আমি শুধু ক্ষত্রিয়ই নই তন্ত্রমন্ত্রও জানি। সেই জন্যই ঐ তান্ত্রিক আমাকে সহজেই ভেবেছে এক তান্ত্রিক। এখন আমাদের সামনে সমস্যা হল কিভাবে আমরা কি করব! কোন কিছু করার আগে আমাদের জানতে হবে যে এই তান্ত্রিক আসলে কে! কি ব্যাপার! তাই কি না বল?" জীবদত্ত বলল।

"তাহলে আর দেরি কেন? গুহায় ঢুকে পড়ি?" একথা বলে খড়্গবর্মা দু চার পা এগিয়ে গেল।

জীবদত্ত খড়্গবর্মাকে অনুসরণ করতে গিয়ে একবার চারদিকে তাকাল। ঠিক সেই সময় ওখানে লোমশ ভূতটাকে মোকাবিলা করার মত কেউ ছিলনা। কিছু লোক লোমশ-ভূতের হাতে মার খেয়ে আহত হয়ে গড়াগড়ি খাচ্ছিল, কিছু লোক লোমশ-ভূতের হাতে হাত পা কাপড় পুড়িয়ে আহত অবস্থায় গোঙাচ্ছিল আর বাকি লোকগুলো নদীর তীর ধরে প্রাণপণে ছুটে পালাচ্ছিল।

শুধু গণ্ডকজাতের তিনজন যুবক তিন দিক থেকে বল্লম নিয়ে ঘিরে ফেলার তাল করছিল। তখন ঐ লোমশভূত 'গুরু গুরু' বলে চিৎকার করে গুহার দিকে ছুটছিল।

"বন্ধু, তুমি একে ভূত মনে করছ নাকি? এমনও তো হতে পারে যে ঐ তান্ত্রিকই এই লোকটাকে নকল রূপ ধারণ করিয়ে অভিনয় করাচ্ছে!" খড়্গ-বর্মা বলল।

"মানুষও যদি হয় তবু আমরা মনে করব ও মানুষ নয়। ও যে জিনিসের অভিনয় করছে আমরা তাকে তাই মনে করব।" জীবদত্ত একথা বলে ঐ গুহার দিকে ছুটে গেল। খড়্গবর্মাও তাকে অনুসরণ করল।

দুজনে যখন লোমশ-ভূতকে অনুসরণ করল তখন সেও এক বাঁদরের মত লাফাতে লাফাতে গুহার দিকে যেতে লাগল।

গণ্ডক জাতের যুবকরাও গণ্ডারের উপর চড়ে তাকে অনুসরণ করল। তারা ঐ লোমশভূতের দিকে তাক করে বল্লম উঁচিয়ে রাখল।

হঠাৎ ঐ তিনজনের একজন তাক্ করে বল্লম ছুঁড়ল ঐ লোমশভূতের দিকে। বল্লম তার পিঠে লেগে ধাক্কা খেয়ে ছিটকে গড়াতে গড়াতে পাহাড়ের নিচে পড়ে গেল।

গণ্ডক জাতের এক যুবক গণ্ডার থেকে নেমে জীবদত্তের কাছে এসে বলল, "কর্তাবাবু একটা মস্ত বড় ভুল হয়ে গেছে। আমাদের কাছে একটা মজবুত দড়ি থাকলে ভূতটাকে ধরে বাঁধা যেত। মনে হচ্ছে আমার বল্লমের আঘাতে সে চোট পায়নি। তার শরীরটাকে ঐ লোমগুলো যেন বর্মের মত রক্ষা করছে।"

"তোমার কথামত এবার আমরা ঐ ভূতটাকে দড়ি ছুঁড়ে বাঁধব। তোমরা এইখানেই থাক। আমরা গুহার ভেতর ঢুকে ঐ ভূত এবং তার তান্ত্রিককে ধরে নিচে ফেলে দেব।" জীবদত্ত বলল।

জীবদত্ত ও খড়্গবর্মা পাহাড়ের ঐ গুহার কাছে পৌঁছানোর আগেই ঐ ভূত গুহার কাছে গিয়ে বলল, "গুরু, গুরু, এক-সিংওয়ালা-মোষে-চড়ে-আসা যমদূতদের সাথে আরও দুজন জুটেছে গুরু।

ওরা সবাই মিলে আমাদের গুহার দিকে আসছে। তুমি গুরু, তাড়াতাড়ি ওদের ভস্ম করে দাও গুরু!"

কিন্তু গুহার ভেতর থেকে কোন সাড়া শব্দ এল না। লোমশ-ভূত ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে পিছনের দিকে তাকাল। তার চোখে পড়ল খড়্গবর্মা ও জীবদত্ত।

তৎক্ষণাৎ সে চিৎকার করে উঠল। আর্তনাদ করে বলল, "গুরু, তাড়াতাড়ি ওদের ভস্ম করুন!"

"আরে এই লোমশ-ভূত! পালিয়ো না। আমরা তোমার গুরুর গুরু! তুমি তোমার গুরুকে বের করে নিয়ে এস।" এ কথা বলে জীবদত্ত হাতের মন্ত্রদণ্ড

উপরে তুলে লোমশ-ভূতের দিকে তাড়াতাড়ি এগিয়ে যেতে লাগল। ঠিক সেই মুহূর্তে গুহার ভেতর থেকে আওয়াজ পেয়ে 'যাচ্ছি, গুরু! যাচ্ছি!' বলে লোমশ-ভূত গুহার ভেতর ঢুকে গেল।

খড়্গবর্মা ও জীবদত্ত মুহূর্তে গুহার ভেতর ঢুকে গেল। কিন্তু তারা সেই লোমশ-ভূতকে আর দেখতে পেল না। গুহার মাঝ থেকে চার-পাঁচ ফুট জায়গা জুড়ে আগুন জ্বলছিল।

তার অদূরে কয়েকটা তেলে ভেজা মশাল ছিল। ঐ আগুনের আলোতে সমস্ত গুহায় ওরা ঐ লোমশ-ভূত ও তান্ত্রিককে খুঁজল।

দশ বার ফুট চওড়া, কুড়ি বাইশ ফুট লম্বা ঐ গুহার কোথাও ওদের পাত্তা ওরা পেল না। ওরা ভাবল এই গুরু শিষ্য দুজনে মিলে গেল কোথায়?

"জীবদত্ত, তুমি কি মনে কর যে এই পাজি বদমাইশ লোকগুলোর অদৃশ্য হবার শক্তি আছে?" খড়্গবর্মা বলল।

"অত ক্ষমতা থাকলে তারা নিশ্চয় ঐ লুণ্ঠনকারীদের লুঠ করে আনা ফসল হাতানোর এত কাণ্ড করত না। ওরা যা করেছে সে তো চোরের উপর বাটপাড়ি করার তাল। এই গুহা থেকে বেরিয়ে বাইরে পালানোর অবশ্যই কোন গোপন পথ আছে। আমরা সাবধানে এক একটা পথ ঘুরে ঘুরে দেখতে পারি।" জীবদত্ত বলল।

তারপর তারা দুজনে গুহার প্রত্যেকটি পাথর জোরে ঠেলে ঠেলে একটা একটা পাথর পরীক্ষা করে দেখতে লাগল।

আধঘন্টা ধরে ওরা প্রত্যেকটা পাথর ঠেলতে লাগল। হঠাৎ একটা চৌকোনো পাথর নড়ে উঠল। সেই পাথরটা চার পাঁচ ফুট উঁচুতে রাখা ছিল।

পাথরটা একটু পিছু সরতেই জীবদত্ত খড়্গবর্মাকে হুশিয়ার করে দিয়ে বলল, "খড়্গবর্মা, ঐ তান্ত্রিক আর লোমশ-ভূত এই পথে পালিয়েছে! পালিয়ে যাবার সময়

আবার পাথরটাকে তারা যেমন ছিল তেমন বসিয়ে দিয়ে গেছে। আমার ধারণা ওরা এর পিছনেই কোথাও গা ঢাকা দিয়ে আছে।"

"তাহলে তোমার কি ধারণা যে আমরা এই পাথর সরিয়ে নেবার সাথে সাথে ওরা আমাদের বল্লম দিয়ে আক্রমণ করবে? তরবারি দিয়ে কেটে ফেলবে না কি?" খড়্গবর্মা বলল।

"হ্যাঁ, সেটাই আমার সন্দেহ।" জীবদত্ত বলল।

"তাহলে তুমি এক কাজ কর। আমরা দুজনে মিলে পাথরটাকে ঠেলে দেবার সাথে সাথে তুমি সরে যাবে। আমি ভেতরে একটা মশাল ছুঁড়ে দেব। দেখব কেউ আক্রমণ করতে আসে কি না। যদি না আসে তাহলে ঐ মশালের আলোতে আমরা জায়গাটা দেখে নিতে পারব। আলোতে দেখার পর আমরা এক পা এক পা করে এগোতে পারি।" খড়্গবর্মা বুঝিয়ে বলল।

"খড়্গবর্মা তুমি যে ভাবে কাজ করতে বলছ তা খুব একটা ভাল না হলেও অগত্যা এখন অন্য কোন ভাবে কি করা যায় তাও আমি ভেবে পাচ্ছি না। এই অবস্থায় তাই করা যাক।" জীবদত্ত বলল।

জীবদত্তের সমর্থন পাবার সাথে সাথে খড়্গবর্মা গুহার মাঝের জলন্ত অগ্নিকুণ্ডের কাছে গিয়ে দুটো মশাল ধরাল। খড়্গবর্মা সেই জলন্ত মশাল দুটো দু হাতে তুলে দেখল।

তারপর ওরা সেই চৌকোনো পাথরটাকে সরিয়ে দিল। সেই পাথরটা গড়িয়ে নিচে পড়ে যাওয়াতো দূরের কথা পাশেই জানালা দরজার মত দাঁড়িয়ে গেল।

সেখান থেকে তারা দেখতে পেল এক সুড়ঙ্গ। জীবদত্ত এক পাশে বসে পড়ল। খড়্গবর্মা ঐ সুড়ঙ্গে হাতের দুটো মশাল ছুঁড়ে দিল।

রুদ্ধশ্বাসে খড়্গবর্মা ও জীবদত্ত কিছু-

ক্ষণ কান খাড়া করে রইল। সুড়ঙ্গের গভীর থেকে কোন সাড়া শব্দ নেই। আরও কিছুক্ষণের কৌতূহলী প্রতীক্ষার পর খড়্গবর্মা হো-হো করে হেসে উঠে বলল, "বন্ধু, ঐ বদমাইশগুলো নিশ্চয় পালিয়েছে। আমাদের চোখে ধূলো দিয়ে ওরা সরে পড়েছে। আমার মনে হচ্ছে আরও একটা গুহা আছে। তা না হলে ওরা গেল কোথায়!"

"তাই হবে। আবার এও হতে পারে যে আমরা গুহায় ঢুকেছি জানতে পেরে তরবারি হাতে তারা আমাদের আক্রমণ করার প্রতীক্ষায় ওৎ পেতে আছে। অতএব আমাদের সবকিছু অত্যন্ত সাবধানে করতে হবে।" জীবদত্ত বলল।

"আর কতক্ষণ অপেক্ষায় থাকব! ভোর হয়ে এল যে!" একথা বলে খড়্গ-বর্মা খাপ থেকে তরবারি বের করে ঐ সুড়ঙ্গের ভেতরের দিকে ঝুঁকে তাকাল। ঠিক তখনই জীবদত্ত বল্লম ছুঁড়ে মারল ঐ সুড়ঙ্গে।

খড়্গবর্মার ছুঁড়ে দেয়া মশালের আলোতে ঐ সুড়ঙ্গের এক কোণে অন্য এক সুড়ঙ্গের পথ দেখে বলল, "খড়্গবর্মা, চল ঐ পথ ধরে আর এক সুড়ঙ্গে ঢুকে পড়ি। ঐ পাজি তান্ত্রিক নিশ্চয়ই ঐ সুড়ঙ্গের কোন গোপন জায়গায় লুকিয়ে আছে। ব্যাটারা আমাদের অনেক জ্বালাচ্ছে তো! আজ ওদের শেষ করতে হবে।"

এ কথা বলে জীবদত্ত ঝট্ করে ঐ সুড়ঙ্গে নেমে গেল। খড়্গবর্মাও তাকে অনুসরণ করল।

সুড়ঙ্গের সেই অংশে ছোট্ট বড় পাথর ছাড়া অন্য কিছু ছিল না। খড়্গবর্মা খোলা তরবারি উঁচিয়ে সুড়ঙ্গ পথে এগিয়ে গেল।

জীবদত্ত মন্ত্রদণ্ড নিয়ে সরবে খড়্গ-বর্মাকে অনুসরণ করতে লাগল।

ঐ পথে এগোতে এগোতে তারা সামনে দেখতে পেল শিথিল নগরের এক বিশাল

প্রান্তর।

সেই প্রান্তরের পাশে কিরাট বিরাট শিথিল নগরের বাড়ি। সেই অট্টালিকা দেখে জীবদত্ত আনন্দিত হয়ে বলল, "খড়্গবর্মা, সূর্যোদয়ের সময় হয়ে এসেছে। আর আমরাও পৌঁছে গেছি সমতল ভূমিতে। এইতো শিথিল নগরের বাড়ি।"

"এই কি শিথিল নগর ? এখানে কি আছে ? কয়েকটা বাড়ি ছাড়া আর কিছু নজরে পড়ছে না!" খড়্গবর্মা বলল।

"শিথিল নগরের এই অংশই হয়ত সবচেয়ে সমৃদ্ধ। তান্ত্রিক ও লোমশ-ভূত এই বাড়িগুলোর কোনটাতে হতে পারে। ওকে যে কোন ভাবে খুঁজে বের করতে হবে।" জীবদত্ত বলল।

জীবদত্তের অনুমান মত তান্ত্রিক ও লোমশ-ভূত ঐ বাড়িগুলোর কোনট্যাতে লুকিয়ে ছিল না।

তারা এক মণ্ডপের উঁচু আসনে বসে থাকা এক দেবী মূর্তির সাজে সজ্জিত নারীর সামনে বসে ছিল। ঐ নারীর আশে পাশে ভয়ঙ্কর আকৃতির লোক অস্ত্র হাতে দাঁড়িয়ে ছিল।

ঐ নারীর চোখ লাল করে দাঁতে দাঁত ঘষে গর্জে উঠল, "ওরে এই তান্ত্রিক, লোমশ-ভূত উঠে দাঁড়া। তোদের মূর্খতার

ফলে এই রহস্যময় পবিত্র স্থানের সন্ধান মানুষ পেয়ে গেছে।"

"মহাশক্তি, আপনার অনুমতি পেলে এক্ষুণি ঐ দুজন মানুষকে আপনার সামনে এনে এই লোমশ-ভূতের আহার করে ফেলতে পারি।" তান্ত্রিক কাঁপতে কাঁপতে বলল।

নারী অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে দু হাত উপরে তুলে নাড়াতে নাড়াতে বলল, "তোমার লোমশ-ভূত এমন বোকা আর অকর্মার ঢেঁকি হয়ে গেছে যে খাবার মুখের সামনে এগিয়ে দিলেও খেতে পারে না। মহাভূতের দয়ায় ঐ দুজন মানুষ এখানে পৌঁছে গেছে। ওরা কারা ?

কোত্থেকে এসেছে? কেন এসেছে? এসব প্রশ্নের জবাব না জেনে ওদের বলি দেওয়া মহাভূতের পক্ষে ক্ষতিকর হবে।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ মহাশক্তি, আপনার কথা আমরা সবাই এখন ভালভাবে বুঝতে পেরেছি।" সেখানকার সমস্ত সেবক সমস্বরে বলল।

ঐ নারী সবার দিকে তাকিয়ে বলল, "এখন আমি যা বলছি কান খাড়া করে শোন মূর্খের দল! ঐ দুজন মানুষকে কোন রকম জখম না করে নিরাপদে আমার কাছে নিয়ে এস। সূর্যোদয় হয়েছে। ওরা এই শিথিল নগরের কোথায় কি আছে দেখতে বেরিয়েছে। তোমাদের মধ্যে কয়েকজন ছদ্মবেশে ওদের অনুসরণ কর। ওরা কি করছে, কোথায় যাচ্ছে, কোন কথা বলছে সব ভাল করে দেখেশুনে শেষে ওদের দুজনকে ধরে, আমার কাছে নিয়ে এস। ঠিক মধ্যাহ্নে আসবে আমার কাছে। ইতিমধ্যে ওরা যেখানে যেতে চায় যাক। যা করতে চায় করুক।

"আজ্ঞে তাই হবে মহাশক্তি!" একথা বলে ঐ নারীর চারজন সেবক। তান্ত্রিক এবং লোমশ-ভূত ঐ মণ্ডপ থেকে চলে গেল।

"গুরু, পিছন দিক থেকে গিয়ে আমি কিন্তু ঐ দুজনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ব। খেয়ে ফেলব ঐ দুজনকে। ঐ ব্যাটাদের জন্যই মহাশক্তির কাছে আমাকে বকা খেতে হল।" লোমশ-ভূত বলল।

"তোমার চেয়ে অনেক বেশি অপমানিত হয়েছি আমি।" এই কথা বলে একটি ছোরা হাতে তুলে নিয়ে শক্ত ভাবে ধরে তান্ত্রিক বলল, "দেখ, ওরা দুজনে এই সুড়ঙ্গের মুখেই বসে আছে। আমরা ঐ দুজনকে মেরে ফেলে সোজা অরণ্য-পথ ধরে পালাব। চল আর দেরি নয়।"

পরক্ষণেই ওরা খড়্গবর্মা ও জীবদত্তের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ল। (চলবে)

সাধনা

বিক্রমাদিত্য আবার সেই গাছের কাছে গেল। শব নামিয়ে কাঁধে ফেলে নীরবে শ্মশানের দিকে হাঁটতে লাগল।

শবেস্থিত বেতাল বলল, "রাজা, কেন যে তুমি এত পরিশ্রম করছ ভেবে পাইনা। গুণকীর্তির মত তুমিও একদিন হাতে পাওয়া জিনিস নিজের হাতেই ধ্বংস করে ফেলবে। গুণকীর্তির কাহিনী শুনলে তুমি তোমার এই পথ চলার পরিশ্রম ভুলে যাবে।"

বেতাল কাহিনী শুরু করল : প্রাচীন কালে শোণাবতী নদী তীরে সদানন্দ নামে এক বীণা বাদক থাকত। লোকে তাকে নতুন সরস্বতী এবং অভিনব নারদ নাম রেখে ছিল। বহু রাজা তাকে নিজের দরবারে নিমন্ত্রণ করত।

কিন্তু সদানন্দের মনে ধন অথবা যশ লাভের কোন ইচ্ছা ছিল না। তার

জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল অধিক সংখ্যক শিষ্যকে নিজের বিদ্যা দান করা। তাই হাজার হাজার শিষ্য তার কাছে থেকে শিক্ষা লাভ করতে পারে। ফলে সদানন্দের অযাচিত ভাবেই রাজ আশ্রয় এবং যশ লাভ হল।

ক্রমে ক্রমে সদানন্দের বয়স হতে থাকে, বৃদ্ধ হয়। যারা বৃদ্ধ সদানন্দের কাছে থেকে শিখতে আসত সদানন্দ তাদের পুরোনো শিষ্যদের কাছে পাঠিয়ে দিত। সেই সময় যুবক গুণকীর্তি তার কাছে এল। সদানন্দকে বীণাবাদন শেখাতে বলল।

"বাবা আমি বৃদ্ধ হয়েছি। আমার অনেক শিষ্য আছে। তাদের একজনের কাছে শিখে নাও।" সদানন্দ গুণকীর্তিকে বলল।

"আজ্ঞে, আপনার শিষ্যদের মধ্যে একজনও পরিপূর্ণ বিদ্যা অর্জন করতে পারেনি। আমি পূর্ণ বিদ্যা অর্জন করার জন্য আপনার কাছে এসেছি। আপনি আমাকে শেখালে আমি বীণা বাজানোর চর্চা করবো। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আপনার যশ অক্ষুণ্ণ রাখতে পারবো।" গুণকীর্তি সবিনয়ে নিবেদন করল।

"বাবা, তোমার উৎসাহ প্রশংসনীয়। কিন্তু আমার সন্দেহ হচ্ছে তোমাকে পূর্ণ শিক্ষা দিয়ে যেতে পারব কিনা। যাই হোক তোমার এই গভীর আগ্রহ এবং দৃঢ় বিশ্বাস দেখে আমারও ইচ্ছে করছে
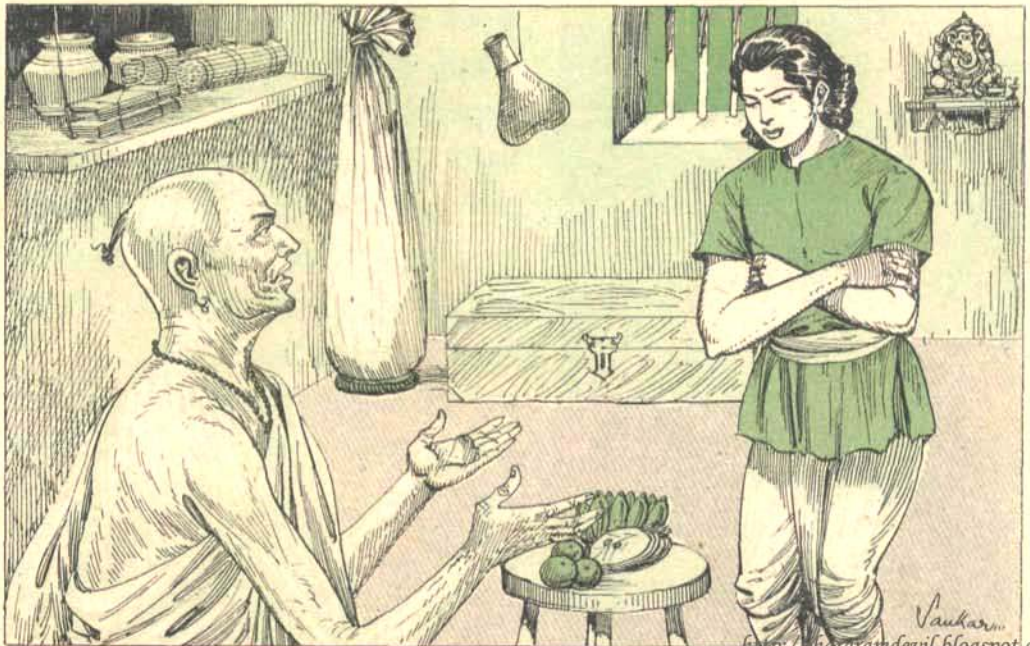
তোমাকে শেখানোর।" সদানন্দ গুণকীতিকে শিষ্য করে নিল।

গুণকীতি গুরুর সেবা করে, যথেষ্ট পরিশ্রম করে, বীণাবাদন শিখতে লাগল।

তা সত্বেও সদানন্দ যা ভেবেছিল তাই হল। গুণকীতির শিক্ষালাভ অর্দ্ধেক হতে না হতেই সদানন্দ অসুখে পড়ে গেল। একদিন গুণকীতিকে কাছে ডেকে সদানন্দ বুঝিয়ে বলল, "বাবা, আমার অন্তিম সময় এসে গেছে। তোমাকে পরিপূর্ণ রূপে শেখানো আর আমার জীবনে হয়ে উঠল না। আর চার পাঁচ বছর আগে যদি তুমি আমার কাছে আসতে তাহলে আমার চেয়ে অনেক বড় বীণা বাদক তোমাকে করতে পারতাম। কিন্তু সে সৌভাগ্য আমাদের দুজনের কারোর ছিল না। আমাদের বংশে চিরকাল একটি বিচিত্র বীণা আছে। তাতে প্রত্যেক স্বর তিনটি স্থানেই ধ্বনিত হয়। যে কোন বীণা বাদক সেই বীণা বাজালে তার আওয়াজ শুনে শ্রোতা মুগ্ধ হবে। সেই বীণা বাজিয়ে তুমি বড় বড় রাজাদের খুশী করতে পারবে। শ্রোতাদের মন্ত্রমুগ্ধ করে তুমি যশ পাবে।" এই কথা বলে সেই বীণা গুণকীতিকে দিয়ে সদানন্দ মারা গেল।

গুণকীতি ভক্তি সহকারে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া কর্ম করল।

তারপর একদিন সেই বীণা নিয়ে রাজ দরবারে হাজির হয়ে বলল, "মহারাজ

আপনি আমাকে আপনার দরবারে বীণা-বাদক করে নিন।"

রাজা দরবারে বীণা বাজানোর অনুমতি গুণকীর্তিকে দিলেন। গুণকীর্তি নিজের পূর্ব পরিচিত সঙ্গীত ঐ বিচিত্র বীণার মাধ্যমে শোনাল। শুনে দরবারের সবাই মুগ্ধ হল। দরবারের কেউ কোনদিন এত ভাল বীণা বাদন অতীতে শোনেনি।

রাজা তৎক্ষণাৎ তাকে নিজের দরবারের বীণাবাদক পদে নিযুক্ত করলেন। সম্মানীও ভালই দিলেন। তার ফলে গুণকীর্তির যশ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

তারপর বহু নাম করা বীণাবাদক গুণকীর্তির বীণাবাদন শুনে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করল।

নানান দেশ থেকে যুবকরা এসে গুণকীর্তির শিষ্য হতে চাইল। কিন্তু গুণকীর্তি ভিন্ন ভিন্ন অজুহাতে ওদের কাউকে শিষ্য করল না।

বিশ্বের চোখে গুণকীর্তি মস্ত বড় প্রতিভাবান যশস্বী বীণাবাদক হলেও মনে মনে তার কিন্তু শান্তি ছিল না।

গুণকীর্তির মনের অবস্থা যখন এতখানি অশান্ত সেই সময় রাজা গুণকীর্তিকে ডেকে বললেন, "আমার মেয়ে কলাবতীকে বীণাবাদন শেখাতে হবে। আমার মেয়ে তোমাকেই মনে মনে ভাবী স্বামী হিসেবে বরণ করেছে।"

রাজার কথা শুনে গুণকীর্তির মনের অশান্তি যেন দ্বিগুণ বেড়ে গেল। মানসিক যন্ত্রণায় সে ছটফট করতে লাগল।

শেষে একদিন গভীর রাত্রে গুণকীর্তি সেই বিচিত্র বীণা নিয়ে গোপনে পালিয়ে গেল। এক নদীর তীরে গিয়ে সেই বীণাটিকে পাথর দিয়ে ভেঙ্গে ফেলে। তারপর সোজা গুরুর আশ্রমে গিয়ে নিজের আগেকার বীণা নিয়ে নতুন করে সাধনা শুরু করল। বহু দিনের অক্লান্ত পরিশ্রমের পর একদিন গুরু ছাড়াই তার সেই সাধনা সিদ্ধ হল।

নিজের সিদ্ধি লাভের পর গুণকীর্তি একদিন ঐ রাজদরবারে গিয়ে সবাইকে বীণাবাদন শুনিয়ে দেয়।

একদিন বিচিত্র বীণায় যে বাদন শ্রোতারা শুনেছিল গুণকীর্তি সেই বাদন তাদের শোনাল।

তারপর গুণকীর্তি কলাবতীকে বীণা-বাদন শেখাল। আরও বহু শিষ্য তার কাছে শিখতে এলে সে তাদের একই ভাবে সানন্দে সাগ্রহে শেখাতে লাগল। তারপর এক শুভ দিনে গুণকীর্তির সাথে কলাবতীর বিয়ে হল।

বেতাল এই কাহিনী শুনিয়ে বলল, "মহারাজ গুণকীর্তি কি ধরণের লোক? বিচিত্র বীণা ভেঙ্গে ফেলা তার পাগলামি নয়? সাধনায় সিদ্ধিলাভ না করলে তার কতখানি ক্ষতি হত? গুণকীর্তি এরকম করল কেন? আমার এসব প্রশ্নের জবাব তুমি জানা সত্বেও যদি না দাও তাহলে তোমার মাথা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।"

একথা শুনে বিক্রমাদিত্য বললেন, "গুণকীর্তি বোকা নয়, পাগলও নয়। তার জীবনে নির্দিষ্ট একটা লক্ষ্য ছিল। সদানন্দের হঠাৎ মৃত্যু ঘটায় তার সেই লক্ষ্য পূরণের পথে বাধা পড়ল। গুরুর কাছে সে চাইল পাণ্ডিত্য কিন্তু সে পেল বিচিত্র বীণা। প্রতিভাশালীর কাছে সাধনার মহত্ব নেই। কিন্তু যে সাধনা করে প্রতিভার মহত্ব অর্জন করতে চায় সে তা না করতে পারলেই অশান্তি ভোগ করে। তাই একদিন গুণকীর্তিকে নিজের হাতে সেই বিচিত্র বীণা ভেঙ্গে চুরমার করতে হয়েছে। গুণকীর্তির মধ্যে আত্মবিশ্বাস পুরোমাত্রায় ছিল। এবং ছিল বলেই একলব্যের মত গুরুকে স্মরণে রেখে সাধনা করে একদিন সে সিদ্ধি লাভ করল। সিদ্ধিলাভ না করলেও তার মনে অশান্তি থাকত না।"

রাজা এইভাবে মৌনভাব ভঙ্গ করার সাথে সাথে বেতাল শব নিয়ে সেই গাছে উঠে পড়ল। (কল্পিত)

তিনটি হাঁচি

মূঢ়মতি নামে ছিল এক কাঠুরের ছেলে। বাবা মারা যাবার পর কাঠ কাটার কাজের ভার মূঢ়মতির ঘাড়ে পড়ল। সে গাধার পিঠে চড়ে অরণ্যে গিয়ে যে ডালে বসেছিল সেই ডালই কাটতে লাগল।

পথে চলতে চলতে এক বুড়ো মূঢ়মতিকে দেখে বলল, "তুমি ঐ ডাল কেটো না, নীচে পড়ে যাবে।"

মূঢ়মতি কোন কথায় কান না দিয়ে ঐ ডাল কেটে নীচে পড়ে গেল। ভবিষ্যতে কি ঘটবে তা যে বলতে পারে সে নিশ্চয় দেবতার সমান। মূঢ়মতি ঐ লোকটাকে ছুটে গিয়ে ধরে জিজ্ঞেস করল, "আজ্ঞে আপনি দয়া করে আমাকে বলে দিন না কবে আমি মারা যাব?"

লোকটা বুঝতে পারল যে মূঢ়মতি খুব বোকা তাই সে বলল, "তোমার গাধা যেদিন তিনবার হাঁচি ফেলবে সেদিনই তুমি মারা যাবে।" বলে চলে গেল সেই লোকটা।

মূঢ়মতি গাধা নিয়ে বাড়ি ফিরছিল। পথে এক জায়গায় আবর্জনা পুড়ছিল। তার ধোঁয়ার ফলে তার গাধা একবার হাঁচি ফেলল। মূঢ়মতি ভয় পেয়ে গেল। মাথার পাগড়ি খুলে সে গাধার মুখ বেঁধে দিল। শ্বাস প্রশ্বাস ঠিক ভাবে চলছিল না বলে সে আবার হাঁচি ফেলল। মূঢ়মতি আরও ভয় পেয়ে গাধার নাকে কাঁকর ঠেলে পুরে দিল। এইজন্য গাধাটি আবার হাঁচি ফেলল। মূঢ়মতি তৎক্ষণাৎ বেহুঁশ হয়ে গেল। পথে যারা চলছিল তারা জল এনে মূঢ়মতির চোখে মুখে জলের ছিটা দিল। তখন সে আস্তে আস্তে চোখ খুলে বলল, "আমি স্বর্গে আছি না নরকে?"

মূঢ়মতির কথা শুনে সবাই হো হো করে হেসে উঠল। —বি. রাণা

চালবাজ

এক গ্রামে রাখালদাস নামে একটা লোক ছিল। তার পেশা ছিল মিথ্যা সাক্ষী দেওয়া। বিচারকরা তার বক্তব্যের উপর বেশী গুরুত্ব দিত না। ফলে রাখালদাস গ্রামান্তরে, দেশ দেশান্তরে ঘুরতে লাগল।

পথে রাখালদাস এক টিন ঘি মাথায় করে এক বেনেকে যেতে দেখল। রাখাল-দাসের পেছনে একজন মজুর যাচ্ছিল।

রাখালদাস ঐ মজুরকে বলল, "ওহে, শোন তোমাকে একটা মতলব দিচ্ছি, তাতে তোমারই উপকার হবে। একটা ছোট্ট কাজ করতে হবে। করবে?"

"উপকার হলে নিশ্চয় করব।" মজুর বলল।

"ঐ যে বেনেটা যাচ্ছে মাথায় ঘিয়ের টিন নিয়ে, ওর ঐ টিনটা কেড়ে নিতে নিতে বলবে ওটা তোমার। বেনে যদি বিচার চাইতে কোথাও যায়, আমি তোমার পক্ষে সাক্ষী দেব। আমার এই মিথ্যে সাক্ষীর জন্য আমাকে কিন্তু দু টাকা দিতে হবে। আমার লাভ হবে দু টাকা আর তুমি পাবে এক টিন ঘি। বুঝতে পেরেছ?" রাখালদাস বলল।

মজুর লোভে পড়ল। সে তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে বেনের কাছ থেকে ঘিয়ের টিনটা কেড়ে নিল। বলল, "খুব মজা পেয়েছ না? আমার ঘিয়ের টিন মাথায় করে চলে যাচ্ছ?"

"একি, এতো আমার। আমি পাশের গ্রাম থেকে কিনে আনছি।" বেনে বলল।

"বললেই হল? সাহস থাকেতো চল বিচারকের কাছে। প্রমাণ হয়ে যাবে এ টিনে আমার।" মজুর বলল।

দুজনে মিলে বিচারকের কাছে গেল। ওদের পেছনে রাখালদাসও গেল।

দুজনের কথা শুনে বিচারক বলল,

রামকৃষ্ণ আচার্য

"তোমাদের দুজনের কথা শুনে কে যে সত্যবাদী বুঝতে পারছি না।"

মজুর বলল, "আজ্ঞে আমার ছেলে-মেয়ে-বউ আছে। আমি কি মিথ্যা কথা বলতে পারি? আমি সামনের গ্রামে আমার মেয়ের কাছে এই ঘি নিয়ে যাচ্ছিলাম। পথে বেনে আমার কাছ থেকে এই টিন কেড়ে নিতে চাইল। আমি বাধ্য হয়ে এই বেনেটাকে আপনার কাছে এনেছি।"

"তুমি যে কথা বলছ তা সত্য কি না প্রমাণ ছাড়া জানব কি করে?" বিচারক মজুরকে বলল।

"আজ্ঞে একজন পথিক দেখেছে। আমি খুঁজে দেখছি পথে তাকে পাই কি না।" বলে মজুর একটু দূরে গিয়ে রাখালদাসকে নিয়ে ফিরল।

বিচারক রাখালদাসকে জিজ্ঞেস করল, "তুমি এদের দুজনকে চেন?"

"আজ্ঞে পথে এদের দুজনকে ঝগড়া করতে দেখেছি।" রাখালদাস বলল।

"তাহলে বল, এই ঘিয়ের টিন কার কাছ থেকে কে কেড়ে নিয়েছে?" বিচারক রাখালদাসকে জিজ্ঞেস করল।

"আজ্ঞে এই মজুর ঘিয়ের টিন মাথায় করে যাচ্ছিল। এই বেনে তার কাছ থেকে ঘিয়ের টিন কেড়ে নিল। এছাড়া আর কিছু দেখিনি হুজুর।" রাখালদাস বলল।

রাখালদাসের কথা শুনে বিচারক
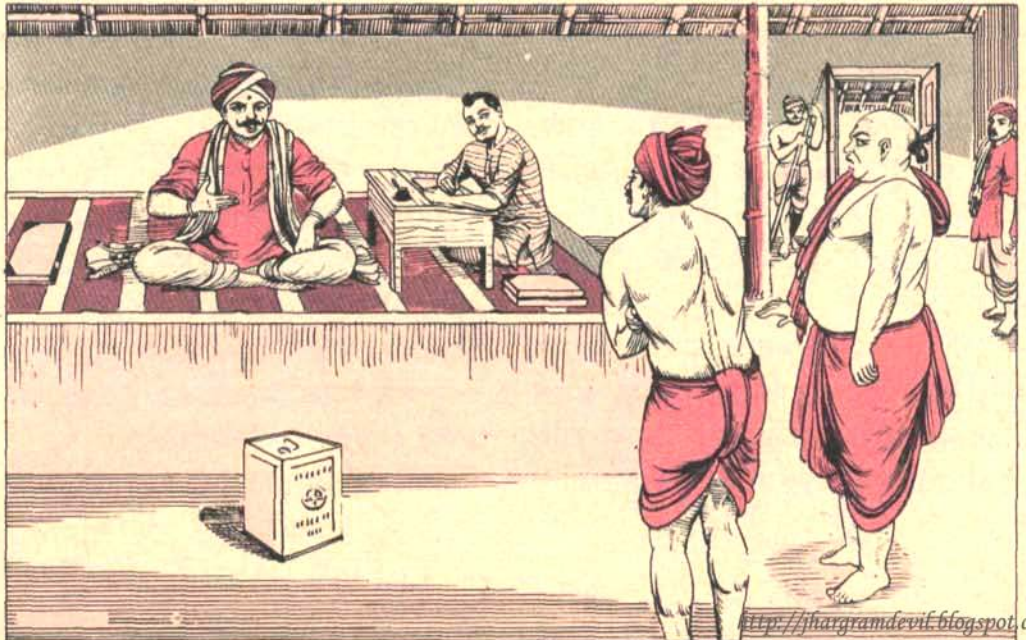
ঘিয়ের টিন মজুরকে দিয়ে দিল। মজুর মহানন্দে ঘিয়ের টিন নিয়ে রাখালদাসকে দুটো টাকা দিয়ে দিল। তারপর তিনজনে পথ চলতে শুরু করে দিল। মজুর পা চালিয়ে যাচ্ছিল। পেছনে ছিল রাখাল-দাস এবং বেনে।

রাখাদাসের চালবাজি বেনে বুঝতে পারল। বেনে মনে মনে ঠিক করল রাখালদাসকে ধোকা দিয়ে যে কোনো ভাবে সে ঐ ঘিয়ের টিন ফেরত নেবে।

বেনে রাখালদাসের সাথে হাঁটতে হাঁটতে বলল, "দেখ ভাই আমি আগে ভেবে ছিলাম তুমি আমার চেয়ে বেশী বুদ্ধি রাখ। কিন্তু এখন প্রমাণ হয়ে গেল তোমার চেয়ে ঐ মজুর অনেক বেশী বুদ্ধিমান। তোমার হাতে মাত্র দুটো টাকা দিয়ে ও কি রকম কুড়ি টাকার ঘি নিয়ে চলে গেল।

"একথা শুনে রাখালদাসের মুখ শুকিয়ে গেল। বেনে আবার বলল, "তুমি যা করলে ঐ রকম কাণ্ড করেই ঘিয়ের টিন পেয়েছি। এই ঘিয়ের টিন কিনে ক্রেতা দোকানদারকে টাকা দিচ্ছিল। আমি ঠিক তখনই ঐ ক্রেতাকে ইশারায় টাকা দিতে বারণ করে ছিলাম। ক্রেতা কি একটা ভেবে দোকানদারকে টাকা দিয়েছি বলল।

"দোকানদার টাকা পাইনি বলল। দুজনের মধ্যে কথা-কাটাকাটি শুরু হল। লোক জমে গেল। ভীড়ের ভেতর থেকে
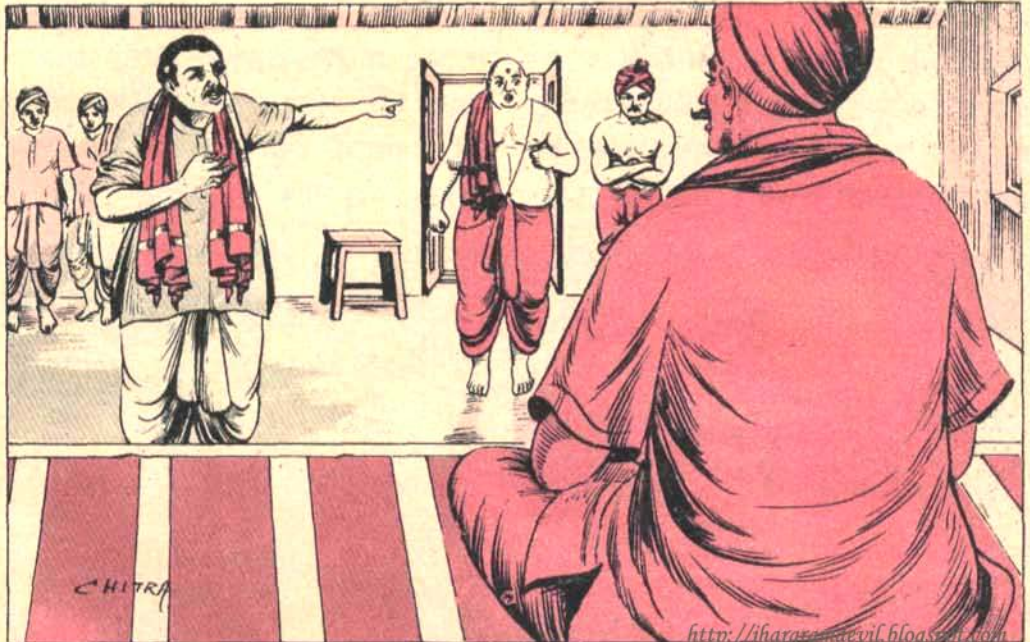
আমি দোকানদারকে বললাম, আরে মশাই আপনি মিথ্যা কথা বলছেন, আমি নিজে দেখেছি আপনাকে টাকা দিতে।

"আমার কথা শুনে সবাই দোকান-দারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। সেই সুযোগে ক্রেতা ঘিয়ের টিন নিয়ে নিজের বাড়ির দিকে চলল।

"আমি তার পেছনে পেছনে গেলাম। সে আমাকে দেখে একগাল হেসে দুটো টাকা দিতে চাইল। কিন্তু আমিতো আর পাগল নই যে মাত্র দু টাকা নিয়ে আস্ত একটা ঘিয়ের টিন ছেড়ে দেব।

"শেষে আমি ঐ ক্রেতার হাতে দু টাকা দিয়ে এই ঘিয়ের টিনটা নিয়েছিলাম। তুমিও চালাকি করেছ বটে কিন্তু শেষে কি পেলে? যা পেলে তাতে আমার হাসি পাচ্ছে। দুঃখও হচ্ছে। মাত্র দুটো টাকা। এখন মজুর যে ভাবে আমার কাছ থেকে ঘিয়ের টিন কেড়ে নিয়েছে তুমিও সেভাবে তার কাছ থেকে কেড়ে নাও। আমি তোমাকে সাহায্য করব। পরিবর্তে তুমি আমাকে কিছু দিও।" বেনে বলল।

রাখালদাস তাড়াতাড়ি হেঁটে মজুরের পথ আগলে দাঁড়িয়ে বলল, "আমার ঘিয়ের টিন তুমি অনেক দূর বয়েছ। এবার আমাকে দাও।"

"সে কি! তোমার সাক্ষীর জন্য তোমাকেতো দু-টাকা দিয়েছি। আমাকে ধোকা দেবার চেষ্টা করো না। খুব খারাপ হবে বলে দিচ্ছি।" মজুর গর্জে উঠে বলল।

রাখালদাস জোর করে ঘিয়ের টিন কেড়ে নিতে চাইল। মজুর মাথা থেকে ঘিয়ের টিন নাবিয়ে রেখে রাখালদাসের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। দুজনে যখন একে অন্যকে প্রচণ্ডভাবে মারছিল তখন বেনে ঠায় দাঁড়িয়ে দেখছিল।

তারপর কিছুক্ষণের মধ্যে আহত হয়ে দুজনেই মাটিতে গড়াগড়ি খেতে লাগল। হঠাৎ ওরা দুজনে দেখতে পেল ঘিয়ের টিন সেখানে নেই। বেনেকেও তারা দেখতে পেল না।

মহাকবি ও আম

মহাকবি গালিব আম ভীষণ ভালবাসতেন। তাঁর কথা বলার ভঙ্গীও ছিল অপূর্ব।

একদিন গালিব বাদশাহের সাথে আম বাগানে বেড়াতে লাগলেন। গাছে গাছে ভর্তি আম ছিল।

প্রত্যেকটা গাছ গালিব খুব ভাল ভাবে দেখছিলেন। বাদশাহ তাঁকে প্রশ্ন করলেন, "কি দেখছেন অত গভীর ভাবে?"

আমার বাপ-ঠাকুর্দার নাম কোন গাছে খোদাই করা আছে কি না দেখছিলাম খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। গাছ আমাদের হলে ফলও আমার হবে।" গালিব বললেন।

গালিবের বক্তব্যের মধ্যে এই কথা নিহিত ছিল যে গাছ যদি বাপ-ঠাকুর্দার হয় তাহলে তিনিও ফল খেতে পারেন। এ কথা অনুধাবন করে আম পাড়িয়ে কয়েক ঝুড়ি আম বাদশাহ পাঠিয়ে দিলেন গালিবের বাড়ি।

একদিন গালিব আম খেয়ে আঁটিগুলো সামনের চত্তরে ফেলছিলেন। ঠিক সেই সময় আম ভালবাসেনা এমন একজন বন্ধু গালিবের কাছে এল। সেই সময় একটি গাধা ঐ আমের আঁটিগুলো যেখানে পড়েছিল সেখানে এসে আঁটিগুলো শুঁকে না খেয়ে চলে গেল। বন্ধু গালিবকে বলল, "দেখলে তো গালিব সাহেব, গাধাও ছুঁল না আম।"

"সত্যি তাই, গাধারা আম খায় না।" গালিব তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন।

—রেবা স্বর্ণকার

এক দিনের রাজা

চার

আবুল হোসেনের চাবুকের ঘা শুকিয়ে গেল। আবুল হোসেনের আর ঘরে থাকতে ভাল লাগছে না। সে আবার বেরুতে শুরু করল অতিথির সন্ধানে। দাঁড়াল সেই পুলের প্রান্তে। আগের মতই সে আবার নতুন অতিথির সন্ধানে রইল।

প্রথম দিনেই খলিফার সাথে দেখা। খলিফা অন্য পোশাকে ব্যবসায়ীর বেশে ছিলেন। তাঁর পিছনে ছিল এক মোটা-সোটা গোলাম।

খলিফাকে দেখেই আবুল মুখ ঘুরিয়ে নিল। একবার যাকে অতীতে নিমন্ত্রণ করেছে তাকে আর কোন দিন অতিথি হিসেবে বরণ করতে চায় না আবুল।

বাদশাহ আর থাকতে পারলেন না। সোজা আবুলের কাছে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, "বন্ধু আবুল হোসেন, কেমন আছ বন্ধু, তোমাকে যে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করছে বন্ধু?"

আবুল মুখ না ফিরিয়ে বলল, "যাও, যাও, আমি তোমাকে চিনি না।"

"কিন্তু আমি তোমাকে সহজেই চিনতে পেরেছি। এক মাস আগে তোমার বাড়িতে বেশ মজাসে কাটিয়েছি। কিন্তু তুমি আমাকে চিনতে পারছ না, একি বিশ্বাস করা যায়?" বাগদাদের বাদশাহ বললেন।

"আল্লার নামে শপথ করে বলছি যে আমি তোমাকে চিনতে পারছি না। যাও, নিজের পথ ধর, কাট।" আবুল বলল।

"বন্ধু, তুমি তোমার বন্ধুকে ভুলে গেলে?" বাদশাহ আবার জিজ্ঞাসা করলেন।

আবুল এবার কোন কথা না বলে

ইশারায় বাদশাহকে যেতে বলল। বাদশাহ তখন হাসতে হাসতে আবুলের গলা জড়িয়ে ধরে বলল, "তোমার এই ব্যবহার আমার ভাল লাগছে না বন্ধু। তুমি আর একবার আমাকে অতিথি করে তোমার বাড়িতে নিয়ে গিয়ে আমাকে জানাও কেন তুমি আমার উপর রাগ করেছ। বল নিয়ে যাবে? উঁ? না নিয়ে গেলে আমি তোমাকে ছাড়ব না। তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে তুমি আমার উপর রাগ করেছ।"

আবুল হোসেন ভীষণ রেগে গিয়ে বলল, "আমাকে এত কষ্ট দিয়ে আবার কোন মুখে আমার অতিথি হতে চাইছ?"

এবার বাদশাহ আবুলকে গলায় জড়িয়ে বললেন, "বন্ধু, আমার জন্য তোমার কোন কষ্ট হয়ে থাকলে বিশ্বাস কর, আমি জেনে শুনে তোমাকে কষ্ট দিইনি। তোমার কি ধরনের কষ্ট হয়েছে জানতে পারলে আমি তার সুরাহা করতে পারি।"

কিছুক্ষণ পরে আবুলের মেজাজ একটু ঠাণ্ডা হল। সে বলল, "সেদিন ভোরে তুমি দরজা বন্ধ না করে চলে গেলে। আর তার ফলে আমার যে দুর্ভোগ হোল তা আর তোমাকে কি বলব!" এভাবে শুরু করে আবুল সমস্ত ব্যাপার জানাল।

বাদশাহ হারুণ-অল-রশীদের মাঝে মাঝে হাসি থামাতে কষ্ট হচ্ছিল। বাদশাহের মুখে হাসির রেখা দেখে আবুল হোসেন বলল, "আমার কষ্টের কথা শুনে তোমার হাসি পাচ্ছে? এই তুমি আমার বন্ধু! আমার কথা বিশ্বাস না হয় আমার পিঠে চাবুকেব দাগ দেখ।" আবুল জামা খুলে পিঠের চাবুকের দাগ দেখাল।

অত চাবুকের দাগ দেখে হারুণ-অল-রশীদের চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল। আবুলকে গলায় জড়িয়ে বাদশাহ বললেন, "ভাই আমাকে শুধু আজ একটি দিনের জন্য অতিথি করে নিয়ে যাও। এর ফলে আল্লাহ তোমার হাজার গুণ ভাল করবে!"

একজনকে দুবার অতিথি হিসেবে বরণ করা আবুলের নিয়ম বিরুদ্ধ কাজ। তবু তাকে নিজের বাড়িতে নিয়ে যেতে বলল, "আমি তোমাকে নিরুপায় হয়ে নিয়ে যাচ্ছি কিন্তু তোমার কাছে আমার বিশেষ অনুরোধ কাল ভোরে ফেরার সময় দরজা বন্ধ করতে ভুলো না।"

বাদশাহ হাসি চেপে তাই করার সম্মতি জানালেন। দুজনে আবুলের বাড়ি পৌঁছাল। এক গোলাম তাদের খাবার এবং মদ দিল। মদ খেয়ে বাদশাহ আবুলকে হঠাৎ প্রশ্ন করলেন, "আচ্ছা বন্ধু, কোন দিন কোন রমণী তোমাকে আকর্ষণ করেনি? বিয়ে করার ইচ্ছা তোমার জাগে নি?"

একথায় আবুল বলল, "বন্ধু-বান্ধবদের সাথেই আমার ভাল কাটে। মদ এবং আড্ডা পেলে আর আমার কিছুই ভাল লাগে না। তার মানে এই নয় যে মেয়েছেলে একেবারেই আমার ভাল লাগে না। আমার মাথায় ভূতে ভর করেছিল যেদিন সেই ঘোরে কতকগুলো যুবতীকে দেখেছিলাম বটে! আহা আহা কি বলব! ওরা সব সময় হাসছে, গাইছে, নাচছে আর যখন যা দরকার বলার আগেই হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে। কী হাসি ওদের মুখে! কী প্রাণ চঞ্চল তারা! ওরকম একটা মেয়েছেলে পেলে যত লাগুক দিয়ে একেবারে কিনে ফেলতাম। তবে, কথা কি জান বন্ধু, ঐ সব মেয়েছেলে কি যেখানে সেখানে পাওয়া যায়। শুনেছি রাজা বাদশাহ-উজির-ওমরাহদের অন্তঃপুরে নাকি ঐ ধরণের মেয়েছেলেরা থাকে। তা বাবা স্বপ্নে হলেও দেখা হয়ে গেল, এই যা। তা ঐ ধরণের মেয়েছেলে আমার কপালে জুটবেও না তাই বিয়ে করার স্বাদও আমার নেই। একটা কথা কি জান বন্ধু, ঐ মেয়েদের মুখ ঝ্যামটা আর মুখ হাঁড়ি করা আমার একদম অপছন্দ। বিরক্তিকর মেয়েদের বিয়ে করার চেয়ে বন্ধু-বান্ধবদের সাথে আড্ডা

মেরে জীবন কাটিয়ে দেওয়া ঢের ভাল।"

একথা বলে আবুল বাদশাহের হাত থেকে মদের পাত্র নিয়ে পান করে বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেল। বাদশাহ এবারের মদে বেহুঁশ হবার ওষুধ মিশিয়ে দিয়েছিলেন।

বাদশাহের ইশারা পেয়েই গোলাম এসে আবুল হোসেনকে কাঁধে ফেলে নিয়ে গেল। তার পিছনে বাদশাহ বাইরে এলেন। এবার কিন্তু উনি খুব সাবধানে দরজা বন্ধ করেছিলেন। বাদশাহের ইচ্ছা ছিলনা আবুলকে বাড়ি ফেরানোর!

বাদশাহ, গোলাম এবং বেহুঁস আবুল-কে নিয়ে গোপন পথে রাজপ্রাসাদে ঢুকলেন। আগের বারের মত বাদশাহ আবুলকে নিজের পোশাক পরিয়ে নিজের বিছানায় শুইয়ে দিলেন! তারপর মন-শূরকে ডেকে আদেশ দিলেন নামাজের আগে যেন ডেকে দেওয়া হয়। তারপর তিনি অন্য এক ঘরে ঘুমোতে লাগলেন।

পরের দিন মনশূর ঠিক সময়ে বাদ-শাহকে জাগালেন। বাদশাহ আবুলের ঘরে ঢুকলেন। সেখানে দেখলেন আবুল গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। আগের বারে যে যুবতীরা আবুলের সামনে এসেছিল, বাদশাহ তাদের সবাইকে ডেকে পাঠালেন। গান বাজনার লোককেও ডেকে পাঠিয়ে তাদের নিজের নিজের জায়গায় দাঁড় করালেন। কাকে কি করতে হবে তা সবাইকে বুঝিয়ে বললেন। আবুলের ঘুম ভাঙ্গানোর জন্য তার নাকের কাছে একটি তরল পদার্থ শুঁকিয়ে দিতে বললেন। আর নিজে পর্দার অন্তরালে লুকোলেন!

ঐ পদার্থ শোঁকার সাথে সাথে আবুলের ঘুম ভেঙ্গে গেল। নেশা কেটে গেল। ঠিক সেই সময় এক অদ্ভুত সঙ্গীত শোনা গেল। কিছুক্ষণ আবুল চোখ বুজেই গান শুনল। তারপর চোখ খুলে চারদিকে তাকাল। এতো সেই ঘর যা একবার সে দেখেছে। সেই রকম সাজানো গোছানো আর তার চেয়ে বড় কথা সেই আগের যুবতীরাই এবারও আছে। আবুল

বিছানা থেকে উঠে বসে চোখ কচলাল।

সঙ্গীত থেমে গেল। সারা ঘরে কোন শব্দ নেই। আবুল হোসেনের তাকানোর সাথে সাথে প্রত্যেক যুবতীর চোখ অর্দ্ধ নিমীলিত হয়ে গেল।

আবুল হোসেন বেশ মেজাজে বলল, "ওরে, আবুল, আবার তোর পিঠের চামড়া তোলার ব্যবস্থা হচ্ছে। আজকে এই স্বপ্ন দেখছ, কাল তোমার পিঠে পড়বে চাবুক আর তারপর হাতে কড়া পড়বে। অন্ধকার ঘরে মাথা ঠুকে কাটাতে হবে অনেক দিন। ওরে মোসলের সওদাগর, তুমি আবার দরজা বন্ধ না করে কেটে পড়লে বন্ধু! তোমার এই অপরাধের ফলে কি হবে জান? নরকে যেতে হবে তোমাকে, এই বলে দিলাম। হ্যাঁ। মোসলের সমস্ত সওদাগর জাহান্নমে যাক। মোসল শহর ধ্বংস হোক।" এ কথা চিৎকার করে বলে চোখ বুজল আবুল। তারপর কিছুক্ষণ ধরে চোখ কচলে আবার বিড় বিড় করে বলল, "ওরে ব্যাটা আবুল, এক কাজ কর চোখ বুজে ঘুমিয়ে পড়। যতক্ষন না ভূত ছাড়ে ততক্ষণ চুপচাপ শুয়ে পড়ে থাক। আজ এই যুবতীদের দিকে তাকালে কাল তোর কি হবে একবার ভাল করে ভেবে দেখ!" তারপর আবার আবুল চোখ বুজল। চোখে ঘুম নেই। তবু সে নাক ডাকার চেষ্টা করল যাতে তার নিজের কাছে মনে হয় যে সে ঘুমিয়ে পড়েছে।
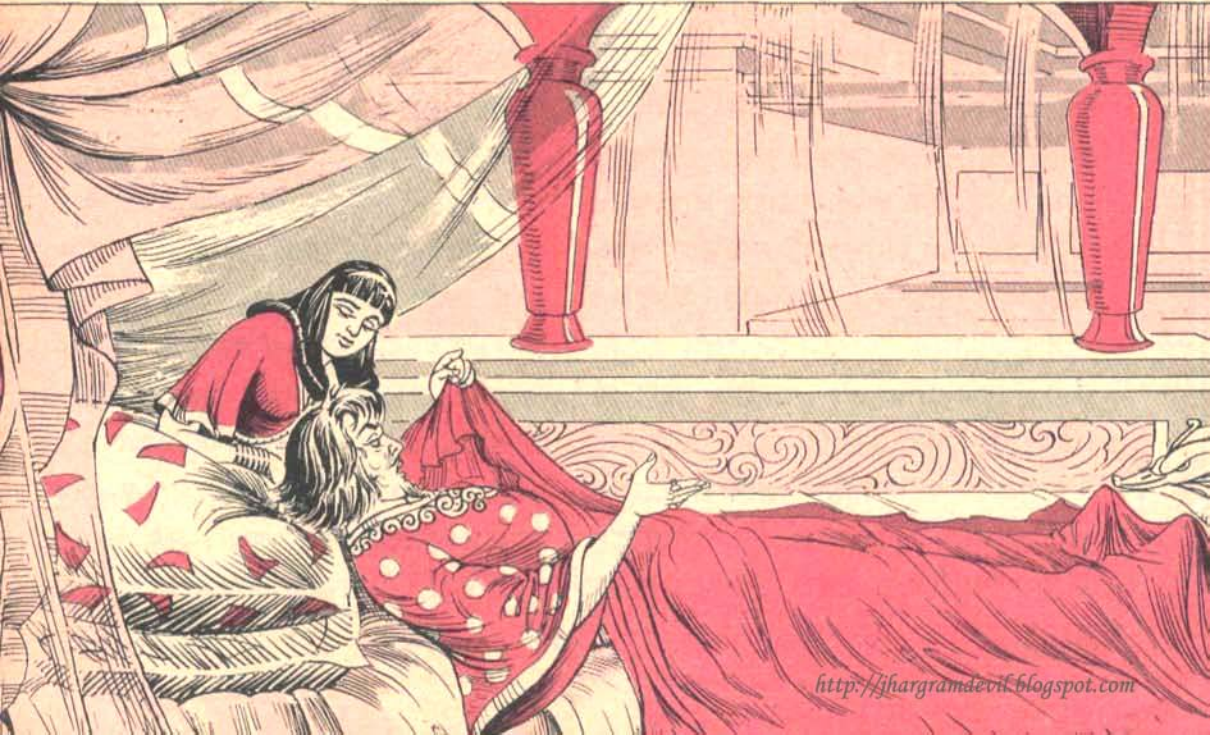
পর্দার আড়াল থেকে এসব দৃশ্য দেখে বাদশাহ হাসি আর চাপতে পারছিলেন না। আবুলই বা ঘুমোবে কি করে। আবুলের যে যুবতীকে ভাল লেগেছিল সেই গন্না যে তার পাশেই বসে বলছিল, "হুজুর দয়া করুন। সকালের নামাজ পড়ার সময় হয়ে গেছে।"

আবুল চাদরের ভেতর থেকে গর্জে উঠে বলল, "শয়তান, যাও এখান থেকে।"

"হুজুর কোন খারাপ স্বপ্ন হয়ত দেখ-ছেন। আমি শয়তান নই, গন্না, আমার নাম গন্না।" সেই যুবতী বলল।

আবুল মুখের উপর থেকে চাদর সরিয়ে দেখল, গন্না বিছানায় বসে আছে। আর বাকি যুবতীরা সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। গন্না একেবারে মাথার কাছে। আবুল ঐ যুবতীদের নাম জানত।

"তোমরা সবাই কারা? কি তোমাদের নাম? আমি কে?" আবুল প্রশ্ন করল।

সবাই সমস্বরে বলল, "আপনি আমাদের মালিক, হারুণ-অল-রশীদ।"

"তোমরা মিথ্যা কথা বলছ! আমি কি আবুল হোসেন নই?" আবুলের প্রশ্ন।

"ক্ষমা করবেন। আপনি কোন ক্রমেই আবুল হোসেন নন। আপনি আমাদের মালিক।" সবাই একসাথে বলল।

আবুল গন্নার দিকে ফিরে বলল, "যাই হোক। যা হচ্ছে তা ভালই। এই মেয়েটা, তুমি আমার কান কামড়ে দাও।"

গন্না আবুলের কান জোরে কামড়াল।

আবুল চিৎকার করে বলল, "আমি সত্যি হারুণ-অল-রশীদ।"

তারপর সঙ্গীত শুরু হল। সমস্ত যুবতী হাতে হাত দিয়ে বিছানার চার-পাশে নাচতে লাগল। আবুল নিজের আনন্দ আর প্রকাশ না করে পারল না। একদিকে বিছানার চাদর অন্যদিকে বালিশ ছুঁড়ে ফেলে বিছানা থেকে নেমে ওদের সাথে নাচতে লাগল।

বাদশাহ আর হাসি চেপে থাকতে না পেরে হো হো করে হাসতে হাসতে পর্দার আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে বললেন, "আবুল হোসেন, তুমি আমাকে হাসিয়ে হাসিয়ে মেরে ফেললে!"

হঠাৎ নাচ বন্ধ হয়ে গেল। যুবতীরা যে যার জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ল। আবুল হোসেনও ঠায় দাঁড়িয়ে রইল।

বাদশাহকে দেখে আবুল চিনতে পারল মোসল শহরের সওদাগরকে। তৎক্ষণাৎ সব ঘটনা আবুলের মনে পড়ে গেল।

আবুল হোসেন বুঝতে পারল যে এই সমস্ত প্রহসন স্বয়ং বাদশাহের নির্দেশেই হচ্ছে। সব বুঝেও না বোঝার ভান করে আবুল সাহসে ভর করে বাদশাহের দিকে এক লাফে গিয়ে তাঁকে বলল, "আরে এই মোসল শহরের সওদাগর, তুমি দরজা বন্ধ করে গেলে না। জান এই অপরাধের শাস্তি কি হতে পারে?"

বাদশাহ আবার হো হো করে হেসে উঠে আবুলকে গলায় জড়িয়ে ধরে বল-লেন, "বন্ধু তুমি যে কষ্ট পেয়েছ, তার জন্য আমি তোমার মনের সবচেয়ে বড় ইচ্ছা পূরণ করে, তোমাকে আমার বন্ধু করে নিতে চাই। বুঝতে পেরেছ?"

তারপর আবুলকে নিজের সবচেয়ে দামী পোশাক পরিয়ে বাদশাহ বললেন, "আবুল তোমার যা ইচ্ছা চেয়ে নাও তুমি পাবে। আমি দেব।" আবুল বাদশাহকে সেলাম করে বলল, "হুজুর, সারা জীবন আপনার আশ্রয়ে থাকতে পারলেই সব-চেয়ে বড় সম্পত্তি পেয়েছি মনে করব।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

অকেজো লোক

প্রাচীনকালে কলিঙ্গ দেশে ধীরসিংহ নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁর একবার ভয়ঙ্কর চর্মরোগ দেখা দিয়েছিল। কত ডাক্তার-বদ্যি দেখানো হ'ল কিন্তু কোন ফল হওয়া দূরে থাক আরও তা বেড়ে যেতে লাগল। তখন রাজবৈদ্য বলল, "মহারাজ এর একমাত্র ওষুধ হল কোন এক অকেজো লোকের রক্ত আপনার দেহে মেশানো।"

রাজার লোক সারা দেশ তোলপাড় করে অবশেষে একজন অকেজো লোককে ধরে বেঁধে আনল। তার নাম অষ্টবক্র। কোন কাজই সে করতে পারত না, জানত না। অষ্টবক্রের মা-বাবাও ছেলেকে ঘৃণা করত। তাই তারা সোনার পরিবর্তে অষ্টবক্রকে বিক্রী করে দিল।

রাজা ধীরসিংহের লোক অষ্টবক্রকে যখন বধ করতে এল তখন সে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে বলল, "তাহলে এখন প্রমাণ হয়ে গেল যে আমি একেবারে অকেজো নই। আমার শরীরের মত শরীর সারা পৃথিবীতে আর একটিও নেই। তা সত্ত্বেও আপনারা কি বলবেন আমি অকেজো ?"

এই কথা শুনে রাজা ধীরসিংহ অষ্টবক্রকে মুক্ত করল। তারপর রাজ বৈদ্যকে ধমক দিল। আবার অন্য ওষুধ আনিয়ে খেয়ে রাজা নিজের চর্মরোগ সারাতে পারল।

—স্বপন ভট্টাচার্য

রাণী-দাসী
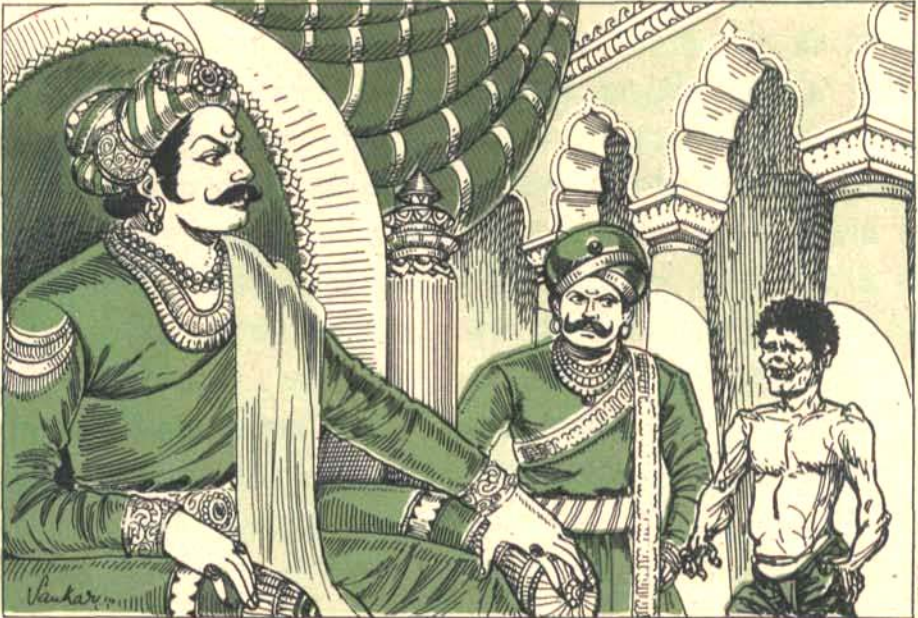
বৈশালী নগরে হীরাদত্ত নামে এক ধনী ছিল। তার বহু বছর কোন সন্তান ছিলনা। শেষে চল্লিশ বছর বয়সে সোনার পুতুলের মত তার এক কন্যা হল। ফলে হীরাদত্তের আনন্দের আর সীমা ছিলনা।

কিন্তু তার সেই আনন্দ অতি অল্প-দিনের মধ্যেই দুঃখে পরিণত হল। সেই শিশুটিকে একদিন বাইরের দোলনায় দেওয়া হয়েছিল। হঠাৎ কোত্থেকে এক বিরাট বাজ (পাখি) এসে সেই শিশুটিকে ঠোঁটে আর পায়ে জড়িয়ে ধরে উড়ে চলে গেল। হীরাদত্ত সমস্ত শিকারীকে পাঠা-লেন ঐ বাজকে শিকার করে নিজের শিশু টিকে উদ্ধার করতে। প্রত্যেক দেশে ঢাক পিটিয়ে দিলেন : যে ঐ শিশুকে এনে দেবে সে যত ধন চাইবে তাকে তত ধন দেওয়া হবে।

কিন্তু কোন ফল হল না। শিশু পাওয়া গেল না। তার কারণ ঐ বাজ আসলে কোন বাজ ছিল না। ছিল এক অভিশপ্ত যক্ষিণী। যক্ষলোক থেকে কিছুদিনের জন্য সে এসেছিল পাখির রূপ ধরে। আকাশে উড়তে উড়তে হীরাদত্তের শিশু-কন্যাকে দেখে তার ভীষণ ভাল লাগল। সে ঠিক করল তাকে তুলে নিয়ে গিয়ে নিজে লালন পালন করবে।

পাখি যেহেতু তুলে নিয়ে গেল সেই হেতু সেই কন্যার নাম হল শকুন্তকুমারী। যক্ষিনীর যত্নে লালিত পালিত হওয়ার ফলে তার অনেক জ্ঞান হয়েছিল। অগাধ জ্ঞানের অধিকারী হয়ে সে ষোল বছরে পরিণত হল।

তখন একদিন যক্ষিনী শকুন্তকুমারীকে বলল, "শোন মা, আমার অভিশপ্ত থাকার দিন শেষ হয়েছে। এবার আমি নিজের লোকে ফিরে যাচ্ছি। তুমি সৌন্দর্য এবং

এ. সি. সরকার (জাদুকর)

বুদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছ। যে কোন রাজকুমার তোমাকে দেখেই সানন্দে বিয়ে করতে চাইবে। তুমি এই পথে গেলে সোজা তোমার মা-বাবার কাছে বৈশালী নগরে পৌঁছে যাবে। তুমি তোমার মা-বাবার সাথে দেখা করে যোগ্য লোককে বিয়ে কর। আর আমার কাছে যা শিখেছ তা প্রয়োগ করে সুখী জীবন যাপন কর।" একথা বলে যক্ষিনী মুহূর্তে নিজের লোকে চলে গেল।

শকুন্তকুমারী নিজের অধিকাংশ জীবন অরণ্যে কাটিয়ে ছিল বটে তবে শহরে জীবনের আদব কায়দাগুলো তার শেখা হয়ে গিয়েছিল। তাই সে ঠিক করল শহরে জীবনে প্রবেশ করবে। তারপর সে বৈশালী নগরের দিকে চলে গেল।

জঙ্গলের পথে এগোতে এগোতে সে এক জায়গায় এক বিচিত্র মহল দেখতে পেল। শকুন্তকুমারী সেই মহলে ঢুকল। তাতে হাতী, ঘোড়া, দ্বারপাল, চাকর-বাকর, দাসদাসী সবাই গভীর ঘুমে আছন্ন ছিল। এ-ঘর ও-ঘরের পর সে ঢুকল শয়ন কক্ষে।

সেই শয়ন কক্ষে এক সুন্দর রাজকুমার ঘুমিয়ে ছিল। ঐ কক্ষের দরজার উপর এক ছবি ঝুলছিল। সেই ছবিও ঐ রাজকুমারের ঘোড়ায় বসে থাকার

ছবি। ঐ ছবির রাজকুমারের গলায় একটা হার আছে। কিন্তু ঘুমন্ত রাজকুমারের গলায় ছিলনা। ঐ হার রাজকুমারের পায়ের কাছে পড়ে থাকা এক কৌটোতে ছিল।

শকুন্তকুমারী ভাবল, এই হারের সাথে রাজকুমারের ঘুমের একটা সম্পর্ক আছে। তার ভাবনা সত্য কিনা পরীক্ষা করে দেখার জন্য সে ঐ হার নিয়ে ঘুমন্ত রাজকুমারে বুকে ঠেকাল। তৎক্ষণাৎ রাজকুমার নড়ে চড়ে উঠল। যেন এক্ষুণি জেগে উঠে বিছানায় বসে পড়বে।

রাজকুমারী আবার সেই হার তুলে নিয়ে কৌটোতে রেখে দিল। অনেক পথ

হাঁটার ফলে তার কাপড় নোংরা হয়ে গিয়েছিল। ছিঁড়েও গিয়েছিল। তাই সে ভাবল রাজকুমারের জেগে ওঠার আগে ঐ রাজমহলের ভাল কাপড় পরে নেবে। তার আগে চান করে নেবে। ফলে তাকে অনেক সুন্দর দেখবে।

সে ঐ কক্ষ থেকে ভাল ভাল কাপড় নিয়ে স্নান করতে গেল। স্নান করতে গিয়ে সে দেখতে পেল এক কুঁজো মেয়ে কাঁদতে কাঁদতে যাচ্ছে। মেয়েটি দেখতে যেমন কুঁজো তেমনি কদাকার। কিন্তু ওকে দেখে শকুন্তকুমারীর কেমন যেন মায়া হল। ওকে জিজ্ঞেস করল, "তুমি কোথায় যাচ্ছ? কাঁদছ কেন?"

"আমার স্বামী আমাকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে। আমি যাচ্ছি মরতে। বাঘের পেটে যেতে চাই। এছাড়া আর কোন পথ আমার সামনে খোলা নেই।" কুঁজো মেয়েটা ভারী গলায় বলল।

"তুমি অত ভেবো না। আমি তোমার খাওয়া-পরার ভার নেব। তুমি এই মহলের কাছে গিয়ে একটু অপেক্ষা কর। আমি এক্ষুণি স্নান করে যাচ্ছি।" শকুন্ত-কুমারী বলল।

কুঁজো মেয়েটা রাজমহলে ঢুকে রাজকুমারের শোবার ঘরে চলে গেল। সেখানে ঐ কৌটো দেখে তার কেমন সন্দেহ জাগল। বের করল ঐ হার। পরিয়ে দিল রাজকুমারের গলায়। তৎক্ষণাৎ রাজকুমার বিছানা থেকে উঠে

পড়ল। পরক্ষণে রাজমহলের সবাই জেগে গেল।

তার ঘুম ভাঙ্গিয়েছে বলে রাজকুমার ঐ কুঁজো মেয়েটার সাথেই বিয়ে করবে স্থির করল।

"আমি এক রাজকুমারী। আমার দাসী এক্ষুণি আসছে।" কুঁজো মেয়েটা রাজকুমারকে বলল।

কিছুক্ষণের মধ্যে শকুন্তকুমারী সেখানে এল। রাজমহলের সবাইকে জাগা দেখে শকুন্তকুমারী ভাবল যে একটা ধোকাবাজী হয়েছে। যা ভেবেছিল তাই। শকুন্তকুমারীকে দেখেই ঐ কুঁজো মেয়েটা বলে উঠল, "এই যে আমার দাসী এসে গেছে।"

শকুন্তকুমারী কুঁজো মেয়েটাকে অনেক গালাগাল দিয়ে রাজকুমারকে সমস্ত ঘটনা জানাল।

তা শুনে রাজকুমার বলল, "তোমাদের দুজনের মধ্যে কে যে দাসী আর কে যে রানী, কে যে কাকে ধোকা দিচ্ছে আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। আমি মাত্র কিছুক্ষণ আগে ঘুম থেকে উঠেছি। আমার ঘুম ভাঙ্গার পরেই এই কুঁজো মেয়েটাকে দেখতে পেয়েছি। তাই আমার ধারণা আমি এর কাছে ঋণী।" রাজকুমার বলল।

"কে যে রানী আর কে যে দাসী তা আমি এক্ষুণি প্রমাণ করে দেব। কতকগুলো কাগজে আমি 'রানী' এবং 'দাসী' লিখে সমস্ত টুকরো একটা বাক্সে ঢালব।
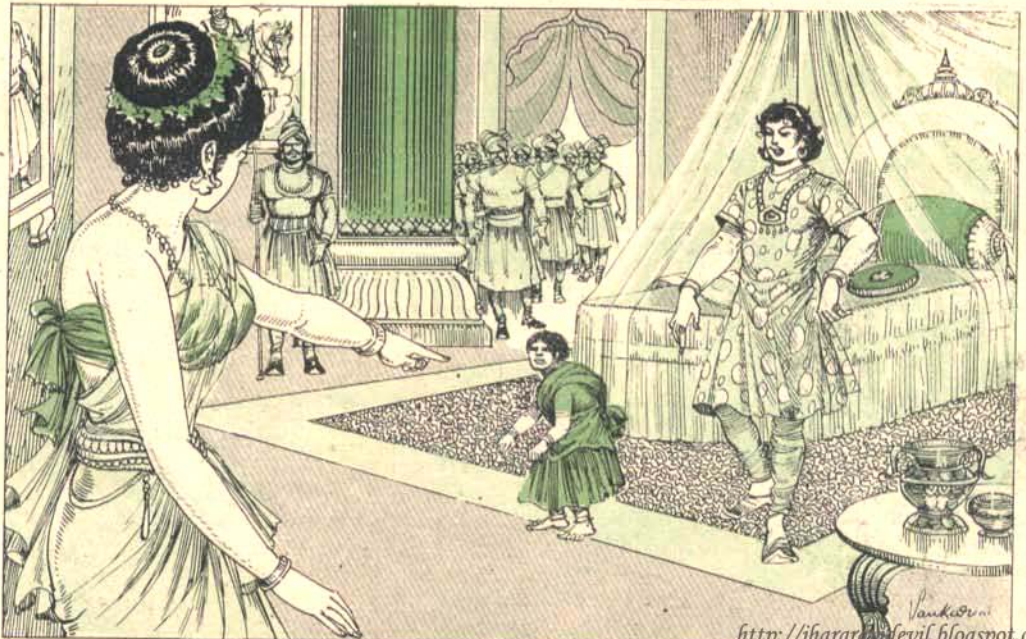
তার থেকে আমি যেগুলো তুলবো সে সব হবে 'রানী'। তাহলে প্রমাণ হয়ে যাবে কে রানী আর কে দাসী।" বলল শকুন্তকুমারী।

কুঁজোমেয়েটা এই প্রস্তাবে রাজী হল। শকুন্তকুমারী অনেকগুলো কাগজের টুকরোতে রানী এবং দাসী লিখে একটা বাক্সে ফেলে চোখ বুজে সেই বাক্স থেকে 'রানী' লেখা সমস্ত কাগজের টুকরো তুলে ফেলল। বাক্সে যে কাগজের টুকরো পড়েছিল তার প্রত্যেকটাতে লেখা ছিল 'দাসী'।

তা দেখে কুঁজো মেয়েটা ভয়ে কাঁপতে লাগল। নিজের অপরাধ স্বীকার করল! শকুন্তকুমারী ঐ কুঁজো মেয়েটাকে ক্ষমা করে নিজের দাসী হিসেবে রেখে দিল। তারপর রাজকুমার ও শকুন্তকুমারীর বিয়ে খুব ঘটা করে হল। সেই বিয়ে দেখতে বৈশালী নগর থেকে শকুন্ত-কুমারীর মা-বাবাও এলেন। যে মেয়েকে পাওয়ার কোন আশাই কোনদিন করেনি সেই মেয়েকে পেয়ে তাঁরা খুব খুশী হলেন।

তারপর শকুন্তকুমারী সমস্ত ঘটনা মা-বাবাকে জানাল। তার মা বলল, "সব তো বুঝলাম। কিন্তু বেছে বেছে শুধু রানী লেখা কাগজের টুকরো বের করলি কি করে মা?"

শকুন্তকুমারী চাপা হাসি হাসতে হাসতে বলল, "কাঁচি দিয়ে কাটা কাগজের টুকরোগুলোর প্রত্যেকটা তিন ভাঁজে ভাগ করলাম। তার মঝের ভাগে 'রানী' লিখে বাকি দুটোতে দাসী লিখে-ছিলাম। তারপর ছিঁড়ে ফেললাম। ফলে, 'রানী' লেখা প্রত্যেক টুকরোর দুদিকে অসমান ছিল। আর দাসী লেখা টুকরোর একদিকে মসৃণ ও অন্যদিকে অসমান ছিল। তাই আমি 'রানী' লেখা কাগজ বেছে বেছে তুলে নিতে পেরেছি। কুঁজো মেয়েটা আমাকে একবার ধোকা দিয়েছিল, আমিও বাধ্য হয়ে তাকে ধোকা দিয়ে প্রতিশোধ নিলাম।
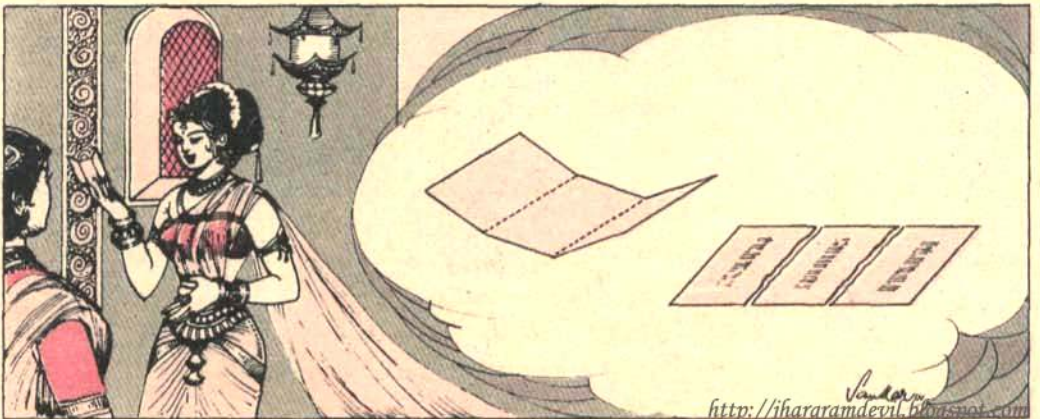
শ্রমের ফল

পাথর প্রতিমা গ্রামে মঙ্গল চৌধুরী নামে এক জমিদার ছিল। সে ছিল ভীষণ রাগী। কিন্তু তার মধ্যে একটা ভাল গুণও ছিল। সততার সাথে যারা কাজ করত তাদের সে দয়া দাক্ষিণ্য দেখাত।

মঙ্গল চৌধুরী নিজের ক্ষেতের কাজ করানোর জন্য দুজন কিষাণকে নিয়োগ করল। তাদের একজনের নাম সমর অন্য জনের নাম সূর্য। সমর খুব কাজ করত। সূর্যের কাজের দিকে মন ছিল না। সমর সব সময় কাজ করত। সূর্য কাজে ফাঁকি দিতে পারলে বেঁচে যেত।

প্রথম দিনেই কাজে লেগে সমর কাজ করতে আরম্ভ করেছিল। কিন্তু সূর্য ফাঁকি দিতে আরম্ভ করে দিল প্রথম দিন থেকেই। কোথায় যেন সে বেড়াতে চলে গেল। সন্ধ্যের সময় কাজ শেষ করে সমর বলদ গুলোকে ভালভাবে ধুয়ে নিজের হাত পা ধুল। তখন সূর্য সেখানে গিয়ে নিজের বলদের গায়ে মাটি লাগিয়ে নিজের গায়েও কাদা মেখে নিল। তারপর তাড়াতাড়ি জমিদার বাড়ি পেঁাছে গেল।

মঙ্গল চৌধুরী তাকে দেখেই ভাবল সূর্য নিশ্চয় সারাদিন ভীষণ কাজ করেছে। সে স্ত্রীকে বলল, "দেখ, আমার মনে হচ্ছে সূর্য খুব কাজের ছেলে। ওকে বেশী করে খেতে দিও।"

সমর বলদ নিয়ে জমিদার বাড়ি পেঁাছাল। বলদের গায়ে বা সমরের গায়ে কাদার ছোপ ছিল না। সমরকে দেখে মঙ্গল চৌধুরী ভাবল সে কাজ করেনি।

সেদিন থেকে যতটুকু না খাওয়ালে

অণু দাস

নয় ততটুকুই সমরকে খাওয়ানো হত। আর সূর্য খেত কাঁড়ি কাঁড়ি।

মঙ্গল চৌধুরীর মেয়ে কমলা খুব চালাক চতুর মেয়ে। ওদের খাবার সময় লক্ষ্য করে কমলা বুঝতে পারে যে সমর বেচারা পেট ভরে খেতে পাচ্ছে না। অপর পক্ষে সূর্য প্রয়োজনের বেশী খাচ্ছে। ওদের বিষয়ে বাবার বিচার বিবেচনা সঠিক কিনা যাচাই করার জন্য একদিন কমলা ক্ষেতে গেল। উদ্দেশ্য, ওদের কাজ কর্ম দেখা। ক্ষেতে সমর একাই কাজ করছিল। সূর্যের অপেক্ষায় থেকে থেকে শেষে তাকে খুঁজতে আরম্ভ করল কমলা। দেখতে পেল সূর্য দূরের এক গাছের নীচে ঘুমোচ্ছে। যারা খাটে তাদের প্রতি বাবার মত কমলাও খুব দরদী। সে সমরের কাছে গিয়ে কাজের ব্যাপারে নানান প্রশ্ন করল। ওর কাজ করার পদ্ধতি অনেকক্ষণ দেখে খুশী হয়ে সে বাড়ি ফিরল। সূর্য গায়ে কাদা মেখে কি ভাবে যে বাবাকে ঠকাচ্ছে তা সে বুঝতে পারল।

বাড়ি ফেরার পর সে তার বাবাকে বলল, "বাবা, ক্ষেতের সমস্ত কাজ একা সমরই করছে। সূর্য সারাদিন গাছের নীচে ঘুমিয়ে সন্ধ্যের সময় বলদের গায়ে আর নিজের গায়ে কাদা মেখে বাড়ি ফেরে। তা দেখে তুমি ভাব যে সূর্য ভীষণ খাটছে। সেই জন্যই তাকে বেশী খেতে দাও। ও যা খায় তা তার হজম হয় না। তাই সে যখন তখন উপোষ করে। আর সারাদিন যে খেটে মরছে সে বেচারা খেতে পাচ্ছে না। ও বেচারা না খেতে পেয়ে রোগা হয়ে যাচ্ছে।" বলল কমলা।

সেদিন সন্ধ্যায় সূর্যকে মঙ্গল চৌধুরী বলল, "কি রে, কাজ কর্ম না করে গায়ে কাদা মেখে বাড়ি ফিরছিস্?"

"আজ্ঞে, আমি সারাদিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খেটে ফিরছি। আপনাকে কেউ হয়ত মিথ্যা কথা বলেছে।" বলল সূর্য।

ততক্ষণে সমর ফিরল। মঙ্গল চৌধুরী

সমরকে প্রশ্ন করল, "আচ্ছা বলত, সূর্য কি সারাদিন ক্ষেতের কাজ করে ?"

"সূর্যকে আমি কাজ করতে কখনও দেখিনি বাবু।" সমর বলল।

"তাহলে একথা আমাকে এতদিন কেন বলনি ?" মঙ্গল চৌধুরী সমরকে জিজ্ঞেস করল।

"আপনি আমাকে জিজ্ঞেস করেননি বলে আমি আপনাকে বলিনি। আমি তো আর তার কাজ কর্ম দেখার জন্য নই।" সমর বলল।

এ কথা শুনে মঙ্গল চৌধুরী সূর্যের দিকে ঘুরে বলল, "তুমি কাজ করছ না বলে আমার মেয়ে বলেছে। এখন সমরও বলল। এবার তুমি কি বলবে ?"

সূর্য তাড়াতাড়ি বলল, "আজ্ঞে হুজুর আসল ব্যাপার তা নয়। আপনার মেয়ে প্রত্যেক দিন ক্ষেতে গিয়ে সমরের সাথে গল্পগুজব করে। পাছে আমি তা প্রকাশ করে ফেলি তাই ঐ দুজন আমার বিরুদ্ধে যা তা লাগাচ্ছে।" বলল সূর্য।

মঙ্গল চৌধুরী তড়িঘড়ি করে কাজ করার লোক। সে আর কাল বিলম্ব না করে সমরকে ভীষণ মেরে কমলাকে বলল, "আবার যদি কোনদিন ক্ষেতে যাবি তো তোর ঠ্যাং খোঁড়া করে দেব।" সেদিন রাত্রে সমরের খাওয়াও বন্ধ করে দিতে মঙ্গল চৌধুরী তার স্ত্রীকে বলল।

সূর্য ভীষণ খুশী। ভাবল আর কেউ তার কাজের দিকে নজর রাখবে না।

সূর্য যেভাবে মিথ্যা কথা বলে অন্য-দের দোষী করল তাতে কমলার মনে অদ্ভুত একটা ধারণা হল। বাবার কাছে সমরের মার খাওয়ার পর থেকে তার প্রতি আরও বেশী করে টান অনুভব করল কমলা।

সেই রাত্রে সে খাবার নিয়ে গিয়ে সমরকে গোপনে খাওয়াল। তারপর নিজের মাকে সূর্যের মিথ্যা অপকর্মের কথা বলল। তার জন্য সমর যে কি ভাবে মার খেল তাও জানাল। বলল, "জান মা, সমর সত্যি খুব কাজের লোক। খুব সৎ। আমি যে প্রত্যেকদিন ক্ষেতে গিয়ে তার সাথে ভাল ভাবে কথা বলিনি, সেটা আমারই অপরাধ হয়েছে।"

মেয়ের মনের অবস্থা মা বুঝল। পরের দিন সমর এবং সূর্য ক্ষেতে যাওয়ার পর সে তার স্বামীকে বলল, "ওদের কাজে নেবার পর থেকে আপনি একদিনও ক্ষেতে যাননি। কেমন কাজ হচ্ছে আপনি একবার দেখে আসুন না।"

স্ত্রীর কথা সত্য ভেবে মঙ্গল চৌধুরী দুপুরে ক্ষেতে কাজ দেখতে গেল। দেখল সমর এক মনে ক্ষেতের কাজ করছে। মনে হচ্ছে যেন সে নিজের ক্ষেতে কাজ করছে। আর সূর্য গাছের নীচে টেনে ঘুমোচ্ছে। তখন মঙ্গল চৌধুরী ভাবল মেয়ে কমলার কথাই সত্য। নিজের মারাত্মক ভুলের জন্য সে মনে মনে অনুতপ্ত হল। কাজে ফাঁকি যে লোকটা দিল, তাকে সে ভরপেট খাইয়েছে আর যে খেটে মরেছে তাকে না খাইয়ে মেরেছে। ঐ ফাঁকিবাজটার কথা শুনে সমরকে মেরে কি ভুল না করেছে। এই সব কথা ভেবে মঙ্গল চৌধুরী লজ্জায় অনুতাপে দগ্ধ হয়ে বাড়ি ফিরল।

স্ত্রীকে জানাল সব ব্যাপার। সে ভেবে পাচ্ছিল না কি ভাবে সে নিজের কাজের সংশোধন করবে।

"আপনি প্রত্যেকটি কাজ তড়িঘড়ি করে করেন। ফলে এক করতে আর

এক হয়। মেয়ে আমাকে আসল ব্যাপার জানিয়েছে। সমর নিষ্ঠার সাথে কাজ করে। সে যেন আমাদেরই পরিবারের একজন। সমরের সাথেই কমলার বিয়ে হলে মেয়ে-জামাই আমাদের চোখের সামনেই থাকবে।" স্ত্রী বলল।

স্ত্রীর কথা শুনে মঙ্গল চৌধুরীর মনে হল বহু সমস্যা তার সমাধান হয়ে গেছে। সেই জন্য স্ত্রীর পরামর্শ কার্যকরী করার কথা ভাবল। সেই সন্ধ্যের আগে মঙ্গল চৌধুরী কয়েকটা বিষয়ে ঠিক করে নিল।

সমর ও সূর্য বাড়ি ফেরার পর মঙ্গল চৌধুরী সূর্যকে বলল, "আরে এই সূর্য, সমরের গায়ে আচ্ছা করে হলুদবাটা ঘষে তাকে গরম জলে স্নান করাও।"

"আপনি কি বলছেন। আমি সারাদিন খেটেখুটে এসেছি, আমি এই ফাঁকিবাজ-টাকে চান করাব!" সূর্য বলল।

"যা বলেছি তা মুখ বুজে না করলে তোর হাড় গোড় ভেঙ্গে দেব।" মঙ্গল চৌধুরী বলল।

সূর্য কর্তার মেজাজ বুঝে আর কোন কথা বলল না। সমরের গা হলুদ তেল দিয়ে ঘষে মালিশ করে তাকে গরম জলে ভাল করে স্নান করাল। এসব যে কেন হচ্ছে তা সমর বুঝতে পারল না।

স্নান করানোর পর মঙ্গল চৌধুরী সমরকে নিজের সাথে এক সারিতে খেতে বসাল। সমর অবাক হয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাচ্ছে দেখে মঙ্গল চৌধুরী তাকে বলল, "সমর, খাও। এক সারিতে বসিয়ে খাওয়াচ্ছি কারণ তুমি যে আমার ভাবী জামাই।"

তখন সমর সব বুঝতে পারল। তারপর, এক ভাল দিনক্ষণ দেখে মঙ্গল চৌধুরী সমর ও কমলার বিয়ে ঘটা করে দিল।

এই ঘটনার পর সূর্য বুঝতে পারল যে সৎ এবং পরিশ্রমী লোক সুখী হয়। সেদিন থেকে সূর্য সততার সাথে কাজ করতে লাগল। তার এই পরিবর্তন দেখে মঙ্গল চৌধুরী খুশী হল।
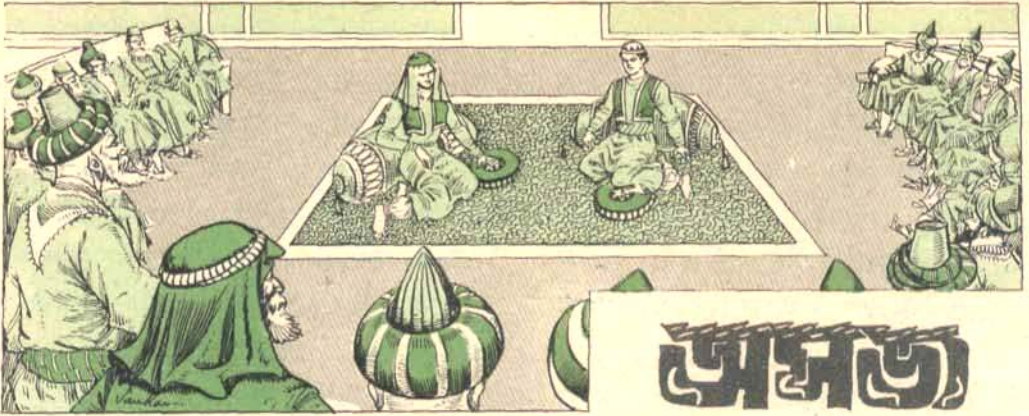
বাগদাদ শহরে আহমদ নামে এক খলিফা শাসন করতেন। তাঁর মনে ছিল অনেক দেশ জয় করে বাদশাহ হবার প্রচণ্ড ইচ্ছা। কিন্তু তাঁর মেয়ে মেহর পছন্দ করত না বাপের এই ইচ্ছা।

খলিফা মেয়ের বিয়ে দিতে চাইলেন।

"আমাকে যে বিয়ে করতে আসবে তাকে প্রথমে আমি একটা গল্প বলব। তারপর তাকে একটা প্রশ্ন করব। সেই প্রশ্নের সঠিক জবাব যে দিতে পারবে তাকেই আমি বিয়ে করব।" মেহর বলল। খলিফা এই শর্ত মেনে নিলেন।

মেহরের প্রশ্নের সঠিক জবাব না দিতে পারলে পাছে অপমানিত হতে হয় সেই ভয়ে অনেক যুবক কেটে পড়ল। কিন্তু এক সুলতানের যুবক পুত্র রজাক মেহরের প্রশ্নের জবাব দিতে চাইল।

রজাকসহ দরবারের সমস্ত লোকের সামনে মেহর এই কাহিনী শোনাল : "প্রাচীনকালে ইজিপ্টে আব্দুল সামাদ নামে এক রাজা রাজত্ব করতেন। সেই রাজা অত ছোট রাজ্যে যেন খুশী ছিলেন না। তাই বিরাট এক সৈন্যবাহিনী গঠন করে পররাজ্য আক্রমণ করতে বেরুলেন। আফ্রিকার বহু রাজা বশ্যতা স্বীকার করলেন।

"কিন্তু বেটসুফা নামে, একজন কোন-ক্রমেই বিনা যুদ্ধে আব্দুলের বশ্যতা স্বীকার করতে চাইলেন না। তার গোটা রাজ্য ছিল পাহাড় আর জঙ্গলে ভরা। তার সেনারাও জঙ্গলেরই ছিল। তিনি অতর্কিতে এক একবার ইজিপ্টের সেনাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে চম্পট দিতেন। তাঁকে সামনাসামনি মোকাবিলা করা আব্দুলের সেনাদের পক্ষে একেবারে অসম্ভব হয়ে পড়েছিল।

বোম্মানা বিশ্বনাথম্

"আসলে বেটসুফার রাজ্য জয় করার উদ্দেশ্য আব্দুলের ছিল না। আব্দুল চেয়েছিলেন বেটসুফা তার বশ্যতা স্বীকার করুক, তার কাছে পরাধীনের মত থাকুক। এই ছিল আব্দুলের চাহিদা। আবার বেটসুফার মত ছিল স্বাধীন ভাবে বাঁচাব। তাঁর এইভাবে বাঁচার স্বাদ ঘুচিয়ে দিতে চান আব্দুল।

"শেষে কোনক্রমেই যখন পেরে উঠতে পারলেন না তখন আব্দুল নিজের সেনা-দের দিয়ে বেটসুফার রাজ্যের সমস্ত বন জঙ্গল কাটিয়ে দিলেন। জঙ্গল পরিষ্কার করে দিলে বেটসুফার সেনারা লুকোতে পারবে না। লুকোতে না পারলে সহজেই তাঁর সেনাদের পরাস্ত করা সম্ভব হবে।

"অন্যদিকে বেটসুফা বাধ্য হয়ে আব্দুলকে সামনাসামনি মোকাবিলা করতে তৈরি হল। প্রচণ্ড যুদ্ধ হল। শেষ পর্যন্ত ইজিপ্টের সেনারাই জয়ী হল। জয়ী হলেও বেটসুফার সেনারা নানান কায়দায় আব্দুলের বহুগুণ বেশী সেনা খতম করল। বেটসুফার সেনারা বীরের মত মৃত্যু বরণ করে স্বর্গে গেল।

"যুদ্ধের শেষে বেটসুফার মৃতদেহ দেখার ইচ্ছে জাগল আব্দুলের। কয়েকজন সেনাকে নিয়ে আব্দুল যুদ্ধক্ষেত্রে গেল।

"যুদ্ধক্ষেত্রে বহু মৃত দেহের মাঝে হঠাৎ
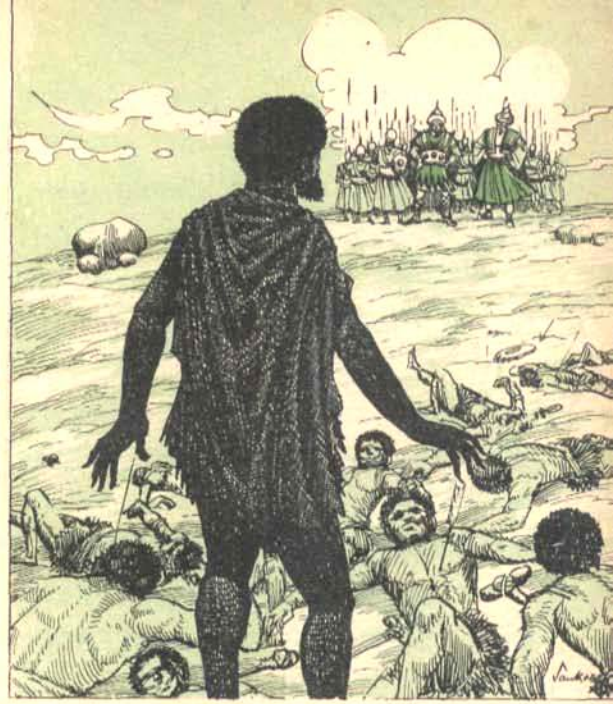
তার নজরে পড়ল একটা কালো ছায়া-মূর্তি চারদিকে তাকাচ্ছে।

'এই ছায়ামূর্তি কার?' আব্দুল তার সেনাপতিকে জিজ্ঞেস করল।

'শুনেছি আফ্রিকার জঙ্গলে মাংসখেকো মানুষ আছে। আমার ধারণা এ হয়ত মৃতদেহগুলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেতে এসেছে।' বলল সেনাপতি।

'একথা শুনে আব্দুল ঐ ছায়ামূর্তির কাছে গিয়ে তাকে বলল, 'তোমার যত-গুলো দরকার নিয়ে যাও। অমন ঘুরে চারদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কি খুঁজছ?'

'এতগুলো মৃতদেহ কোন লোক নিশ্চয় খাবার জন্যেই মেরেছে। আমারতো

একটা মৃতদেহ হলেই চলবে। আমি খুঁজছি সেই লোকটাকে যে এতগুলো মৃতদেহ খেতে চায়, যে লোকটা এত-গুলো মানুষকে মেরে ফেলেছে। তাছাড়া ঐ লোকটার অনুমতি না নিয়ে আমিই বা একটা মৃতদেহ নেব কি করে।" কালোমূর্তি বলল।

"একথা শুনে হো হো করে হেসে উঠে আব্দুল বলল, 'আরে এসব তো আমি মেরেছি। তবে তুমি যে ভাবছ এসব খাবার জন্য মেরেছি তা নয়, বুঝলে?'

"কালোমূর্তি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তাহলে কিসের জন্য এতগুলো লোককে মেরে ফেলেছ?'

"তখন সেই রাজা আব্দুল নিজের সেনাপতিকে বলল, 'আফ্রিকার এই লোকগুলো এত অসভ্য যে এদের কিছু বোঝান যায় না। এমন অদ্ভুত প্রশ্নের কি জবাব দেব?'

"কালোমূর্তি হো হো করে হাসতে হাসতে কোথায় যেন চলে গেল।"

মেহর এই কাহিনী শুনিয়ে যুবরাজ রজাককে জিজ্ঞেস করল, "কালোমূর্তি হো হো করে হাসল কেন?"

"অসভ্য এবং জঙ্গলী আফ্রিকার ঐ কালো লোকটা একমাত্র খিদে পেলেই মানুষকে মেরে ফেলে। কিন্তু নিজেকে সভ্য জগতের লোক ভেবে শুধু মাত্র নিজের ক্ষমতা সম্প্রসারণের জন্য আব্দুল হাজার হাজার মানুষকে মেরে ফেলল। ভাল-ভাবে ভেবে দেখলে আমরা সহজেই বুঝতে পারব ঐ দুজনের মধ্যে কে অসভ্য। সেই জন্যেই কালো লোকটা হাসলো।" রজাক জবাবে বলল।

রজাকের জবাবই সঠিক জবাব বলে মেহর ঘোষণা করল। তারপর তাদের দুজনের বিয়ে হল।

মেহর যে কাহিনী শোনাল এবং রজাক মেহরের প্রশ্নের জবাবে যে উত্তর দিল—সব শুনে মেহরের বাপের মনে পর-রাজ্য আক্রমণের যে প্রচণ্ড আকাঙ্খা ছিল তা ক্রমে ক্রমে লুপ্ত হতে লাগল।

যুধিষ্ঠির, বিরাট ও দ্রুপদ সকলে যুদ্ধের আয়োজন করতে লাগলেন, এবং নানা দেশের রাজাদের কাছে দূত পাঠালেন। আমন্ত্রণ পেয়ে রাজারা সানন্দে আসতে লাগলেন।

যুধিষ্ঠিরের মত নিয়ে দ্রুপদ তাঁর পুরোহিতকে বললেন, "আপনি বয়সে বৃদ্ধ ও জ্ঞানী, দুর্যোধনের ব্যবহার সবই জানেন। আপনি যদি ধৃতরাষ্ট্রকে ধর্ম-সম্মত কথায় বোঝাতে পারেন তবে দুর্যোধন প্রমুখের মনের পরিবর্তন নিশ্চয় হবে। বিদুর আপনাকে সমর্থন করবেন। ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ প্রভৃতিরাও এর লক্ষ্য বুঝবেন। অমাত্যগণ যদি ভিন্ন মত পোষণ করেন এবং যোদ্ধারা যদি রাজী না হোন তবে তাদের পুনরায় রাজী করানো দুর্যোধনের পক্ষে কষ্টকর হবে, তাঁর সৈন্য সংগ্রহে বাধা পড়বে। সেই সুযোগে পাণ্ডবগণের যুদ্ধ-প্রস্তুতি এগিয়ে যাবে। আমাদের এখন প্রধান প্রয়োজন এই যে আপনি ধর্মসংগত যুক্তির মাধ্যমে ধৃতরাষ্ট্রকে নিজের মতে আনবেন।

অতএব পাণ্ডবগণের মঙ্গলের জন্য আপনি পুষ্যা নক্ষত্রের যোগে জয়সূচক শুভ সময়ে যাত্রা করুন।" দ্রুপদের উপদেশ অনুসারে পুরোহিত তাঁর শিষ্যদের নিয়ে হস্তিনাপুরে যাত্রা করলেন।

"অন্যান্য দেশে দূত পাঠাবার পর অর্জুন স্বয়ং দ্বারকায় যাত্রা করলেন। পাণ্ডবগণ কি করছেন তার সমস্ত খবর

দুর্যোধন তাঁর গুপ্তচরদের কাছে পেতেন। কৃষ্ণ-বলরাম প্রভৃতি নিজ ভবনে ফিরে গেছেন শুনে দুর্যোধন অল্প সৈন্য নিয়ে অশ্বারোহণ করে দ্রুত দ্বারকায় এলেন। অর্জুনও সেদিন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। কৃষ্ণ ঘুমিয়ে আছেন জেনে দুর্যোধন ও অর্জুন তাঁর শয়নকক্ষে এলেন। প্রথমে দুর্যোধন এসে কৃষ্ণের মাথার কাছে একটি উৎকৃষ্ট আসনে বসলেন। তারপর অর্জুন এসে কৃষ্ণের পায়ের কাছে বিনীতভাবে হাত গুটিয়ে দাঁড়ালেন।
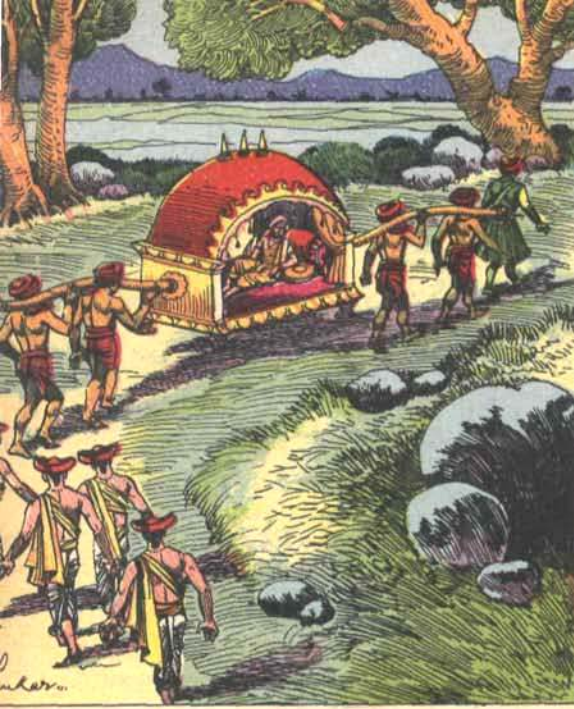
জেগে উঠে কৃষ্ণ প্রথমে অর্জুনকে, পরে পেছনের দিকে তাকিয়ে সিংহাসনে উপাবিষ্ট দুর্যোধনকে দেখলেন। তিনি স্বাগত সম্ভাষণ করে দুজনের আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করলেন।

দুর্যোধন হাসিমুখে বললেন, "মাধব, আসন্ন যুদ্ধে তুমি আমার সহায় হও। আমার আর অর্জুনের সাথে তোমার সমান বন্ধুত্ব, একই সম্বন্ধ। আমি আগে এসেছি, সাধুজন প্রথম যে আসে তাকেই বরণ করেন। তুমি সাধুশ্রেষ্ঠ। সদাচার রক্ষা কর।"

কৃষ্ণ বললেন, "রাজা, তুমি প্রথমে এসেছ, তাতে আমার সন্দেহ নেই, কিন্তু আমি ধনঞ্জয়কেই প্রথমে দেখেছি। অতএব, দুজনকেই সাহায্য করব। যারা বয়সে ছোট তাদের ইচ্ছা আগে পূরণ করা উচিত। সেজন্য প্রথমে অর্জনকেই বলছি, নারায়ণ নামে খ্যাত আমার দশ কোটি গোপ যোদ্ধা আছে, তাদের শক্তি আমারই সমান। পার্থ, তুমি সেই দুর্ধর্ষ নারায়নী সেনা চাও, না যুদ্ধবিমুখ নিরস্ত্র আমাকে চাও ? তুমি ভেবে দেখ।"

কৃষ্ণ যুদ্ধ করবেন না জেনেও অর্জুন তাঁকেই বরণ করলেন। দুযোধন দশ কোটি যোদ্ধা নিলেন এবং পরম আনন্দে মনে করলেন যেন কৃষ্ণকেই পেয়েছেন। তারপর বলরামের কাছে গিয়ে দুর্যোধন তাঁর আসবার কারণ জানালেন।

বলরাম বললেন, "বিরাটভবনে

বিবাহের পর আমি যা বলেছিলাম তা বোধ হয় তুমি জান। তোমার জন্যই আমি বার বার কৃষ্ণকে বাধা দিয়ে বলেছিলাম যে দুই পক্ষের সঙ্গেই আমাদের সমান সম্বন্ধ। কিন্তু তিনি আমার মত গ্রহণ করেননি। আমিও তো তাঁকে ছেড়ে এক মুহূর্তও থাকতে পারি না। কৃষ্ণের মতিগতি দেখে আমি ঠিক করেছি যে আমি পার্থের সহায় হব না, তোমারও সহায় হব না। পুরুষ শ্রেষ্ঠ, ক্ষাত্রধর্ম অনুসারে যুদ্ধ কর।" দুর্যোধন বলরামকে আলিঙ্গন করে বিদায় নিলেন। তিনি মনে করলেন যে কৃষ্ণ তাঁর বশে এসেছেন, যুদ্ধেও তাঁর জয় নিশ্চিত। তারপর তিনি কৃতবর্মার সাথে দেখা করলেন। তাঁর কাছে এক অক্ষৌহিনী সৈন্য লাভ করলেন।

দুর্যোধন চলে গেলে কৃষ্ণ অর্জুনকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আমি যুদ্ধ করব না তবুও তুমি আমাকে বরণ করলে কেন?" অর্জুন বললেন, "নরোত্তম, তুমি একাই সমস্ত শত্রু সংহার করতে পার এবং তোমার যশও লোক-খ্যাত। আমিও শত্রু সংহার করতে চাই, যশের প্রার্থী, এই কারণেই তোমাকে বরণ করেছি। এ আমার চিরদিনের ইচ্ছা, তুমি সম্মত হও।"

বাসুদেব বললেন, "পার্থ, তুমি যে স্পর্ধা কর তা তোমারই উপযুক্ত। সারথি হয়ে তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করব।"

তারপর কৃষ্ণ ও দাশার্হ বীরগণের সাথে অর্জুন আনন্দিত মনে যুধিষ্ঠিরের কাছে ফিরে এলেন।

আমন্ত্রণ পেয়ে মদ্ররাজ শল্য, নকুল-সহদেবের মাতুল, তাঁর বৃহৎ সৈন্যদল ও মহাবীর পুত্রগণকে নিয়ে পাণ্ডবগণের নিকট যাচ্ছিলেন। এই সংবাদ শুনে দুর্যোধন পথের মধ্যে তাঁর অভ্যর্থনার আয়োজন করলেন। তাঁর আদেশে স্থানে স্থানে বিচিত্র সভা মণ্ডপ, কূপ, দীঘি, পাকশালা প্রভৃতি কর্মীরা নির্মাণ
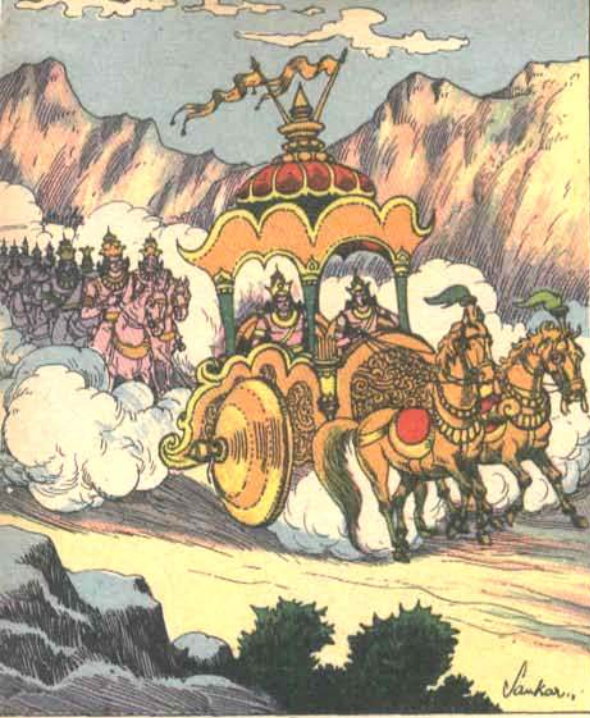
করলেন। নানাপ্রকার ক্রীড়া এবং খাদ্য পানীয়েরও আয়োজন করা হল। শল্য উপস্থিত হলে দুর্যোধনের সচিবগণ তাঁকে দেবতার ন্যায় পূজা করলেন।

শল্য বললেন, "যুধিষ্ঠিরের কোন্ কর্মচারি এই সকল সভা মণ্ডপ তৈরী করেছে? তাদের ডেকে আন, যুধিষ্ঠিরের সম্মতি নিয়ে আমি ছাদের পারিতোষিক দিতে চাই।" দুর্যোধন আড়ালে ছিলেন, এখন শল্যের কাছে এলেন। দুর্যোধনই সমস্ত আয়োজন করেছেন জেনে শল্য প্রীত হয়ে তাঁকে আলিঙ্গন করে বললেন, তোমার কি ইচ্ছা বল, আমি তা পূর্ণ করব।"

দুর্যোধন বললেন, "আপনি আমার সমস্ত সেনার নেতৃত্ব করুন।"

শল্য বললেন, "করব; আর কি চাও?"

দুর্যোধন বললেন, "আমি কৃতার্থ হয়েছি, আর কিছু চাই না।"

শল্য বললেন, "দুর্যোধন, তুমি এখন নিজ দেশে ফিরে যাও, আমি যুধিষ্ঠিরের সাথে দেখা করতে যাচ্ছি।"

দুর্যোধন বললেন, "মহারাজ, আপনি দেখা করে তাড়াতাড়ি আমাদের কাছে আসবেন। আমরা আপনারই অধীন, যে বর দিয়েছেন তা মনে রাখবেন।"

দুর্যোধনকে আশা দিয়ে শল্য উপপ্লব্য নগরে যাত্রা করলেন।

পাণ্ডবগণের শিবিরে এসে শল্য যুধিষ্ঠিরাদির সাথে আলিঙ্গন করলেন এবং কুশল প্রশ্ন করলেন। আলাপের পর দুর্যোধনকে যে বর দিয়েছেন তা জানালেন।

যুধিষ্ঠির বললেন, "আপনি দুর্যোধনের প্রতি তুষ্ট হয়ে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা ভালই। এখন আমার একটি উপকার করুন, যদি অকর্তব্য মনে করেন তবুও আমাদের মঙ্গলের জন্য তা আপনাকে করতে হবে। আপনি যুদ্ধে বাসুদেবের সমান, কর্ণ আর অর্জুন দুই রথীর যখন যুদ্ধ হবে তখন আপনি

নিশ্চয় কর্ণের সারথি হবেন। আপনি অর্জুনকে রক্ষা করবেন, যদি আমার প্রিয় কার্য করতে চান তবে কর্ণের তেজ নষ্ট করবেন। মাতুল, অকর্তব্য হলেও এই কাজ করবেন।"

শল্য বললেন, "আমি নিশ্চয় দুরাত্মা কর্ণের সারথি হব। সে আমাকে কৃষ্ণ-তুল্য মনে করে। যুদ্ধকালে আমি তাকে এমন প্রতিকূল ও অহিতকর কথা বলব যে তার দর্প ও তেজ নষ্ট হবে এবং অর্জুন তাকে খুব সহজে বধ করতে পারবেন। বৎস, তুমি যা বলেছ তা আমি করব, এবং তোমার প্রিয় কার্য আর যা পারব তাও করব। যুধিষ্ঠির, তুমি ও কৃষ্ণা দ্যূতসভায় যে দুঃখ পেয়েছ, সূতপুত্র কর্ণের কাছে যে নিষ্ঠুর বাক্য শুনেছ, জটাসুর ও কীচকের কাছে দ্রৌপদী যে ক্লেশ পেয়েছেন, সে সবের ফল পরিণামে সুখের হবে। মহাত্মা ও দেবতারাও দুঃখভোগ করেন, কারণ দৈবই প্রবল। ইন্দ্রও তাঁর পত্নীর সাথে মহৎ দুঃখভোগ করেছিলেন।"

যুধিষ্ঠির প্রশ্ন করলেন, "মহারাজ ইন্দ্র ও তাঁর পত্নী কি প্রকারে দুঃখভোগ করেছিলেন?"

শল্য বললেন: ত্বষ্টা নামে এক প্রজাপতি ছিলেন। তিনি ইন্দ্রের প্রতি বিদ্বেষযুক্ত হয়ে ত্রিশিরা নামক এক পুত্রের জন্ম দিলেন। ত্রিশিরার তিন মুখ সূর্য, চন্দ্র আর অগ্নির মত। তিনি এক
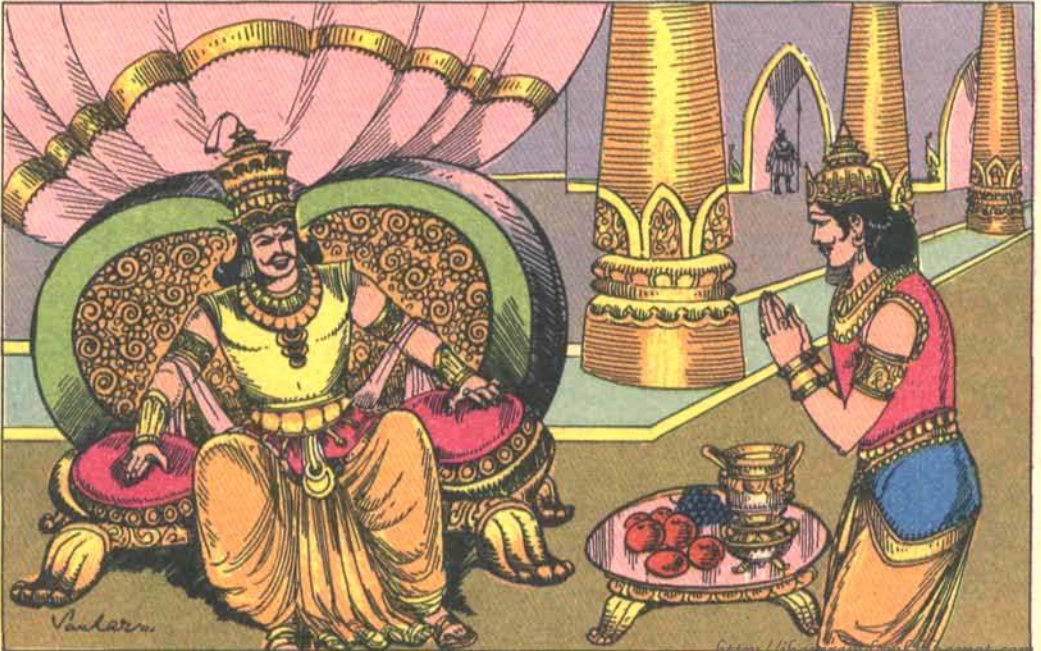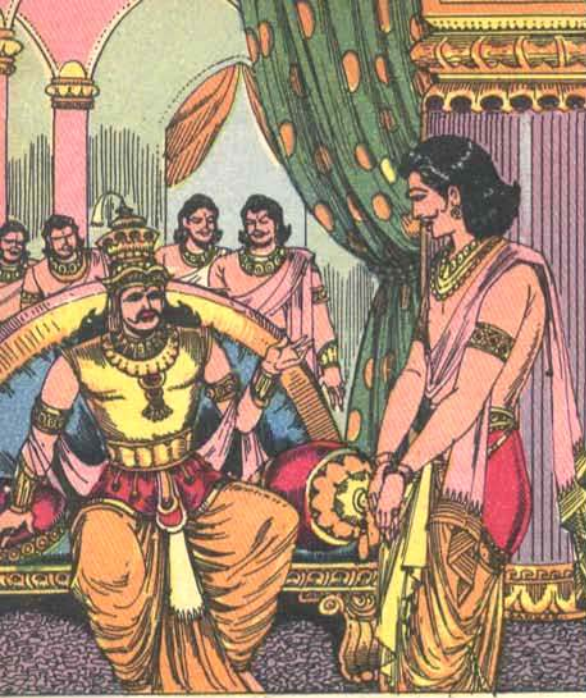
মুখে বেদ অধ্যয়ন, আর এক মুখে সুরা-পান এবং তৃতীয় মুখে যেন সর্বদিক গ্রাস করে নিরীক্ষণ করতেন। ইন্দ্রত্ব লাভের জন্য ত্রিশিরা কঠোর তপস্যায় মগ্ন হলেন। তাঁর তপোভঙ্গের জন্য ইন্দ্র বহু অপ্সরা পাঠালেন, কিন্তু ত্রিশিরা বিচলিত হলেন না। তখন তাঁকে মারবার জন্য ইন্দ্র বজ্র নিক্ষেপ করলেন। ত্রিশিরা নিহত হলেন, কিন্তু তাঁর মাথা জীবিতের মত রইল। ইন্দ্র ভয় পেয়ে একজন ছুতোরকে বললেন, "তুমি কুঠার দিয়ে এর মাথা কেটে ফেল।" ছুতোর বলল, "তাঁর কাঁধ অতিশয় বিরাট, আমার কুঠারে কাটা যাবে না। এমন কাজ আমি পারব না। কে আপনি? এই ঋষিপুত্রকে হত্যা করে ব্রহ্মহত্যার ভয় করছেনা আপনার?"

ইন্দ্র বললেন, "আমি দেবরাজ, এই মহাবল পুরুষ আমার শত্রু, সেজন্য বজ্রের আঘাতে একে বধ করেছি। পরে আমি কঠোর প্রায়শ্চিত্ত করব। ছুতোর, তুমি শীঘ্র এর মাথা কেটে দাও, আমি তোমার প্রতি দয়াশীল হব। লোকে যজ্ঞ করে নিহত পশুর মুণ্ড তোমাকে দেবে।"

ছুতোর রাজী হয়ে ত্রিশিরার তিনটে মাথা কেটে ফেলল। প্রথম মাথা থেকে চাতক পাখীর দল, দ্বিতীয় মাথা থেকে চড়াই পাখী ও বাজ পাখী এবং তৃতীয় মাথা থেকে তিত্তির পাখীর দল বেরোল। ইন্দ্র খুশী মনে গৃহে চলে গেলেন।

পুত্রের মৃত্যু সংবাদ ত্বষ্টা পেয়ে খুব রেগে গেলেন। ইন্দ্রকে বিনাশ করবার জন্য অগ্নিতে আহুতি দিয়ে বৃত্রাসুরকে সৃষ্টি করলেন। ত্বষ্টার আদেশে বৃত্র স্বর্গে গিয়ে ইন্দ্রকে গ্রাস করলেন। দেবতারা চিন্তিত হয়ে হাই সৃষ্টি করলেন। তার ফলে বৃত্রও হাই তুললেন। ইন্দ্র তখন দেহ ছোট করে বেরিয়ে এলেন। তারপর ইন্দ্র বহুদিন বৃত্রের সাথে যুদ্ধ করলেন, কিন্তু তাঁকে দমন করতে পারলেন না। তিনি বিষ্ণুর শরণাপন্ন হলেন। বিষ্ণু বললেন, "দেবতা ঋষি ও গন্ধর্বদের নিয়ে তুমি

বৃত্রের কাছে যাও, তার সঙ্গে সন্ধি কর। এই ভাবে তুমি জয়লাভ করবে। আমি অদৃশ্যভাবে তোমার সাথে থাকব।"

ঋষিরা বৃত্রের কাছে গিয়ে বললেন, "তুমি দুর্জয় বীর, তোমার তেজ জগৎ বিস্তৃত হয়ে আছে। কিন্তু তুমি ইন্দ্রকে জয় করতে পারনি। দীর্ঘদিন যুদ্ধের ফলে দেবাসুরও মানুষ সকলেই পীড়িত হয়েছে। অতএব ইন্দ্রের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন কর, সুখ ও স্বর্গ লাভ করবে।"

বৃত্র বললেন, "আপনারা যদি এই ব্যবস্থা করেন যে শুকনো বা ভিজে জিনিস অথবা পাথর বা কাঠ বা অস্ত্র-শস্ত্র দিয়ে, দিনে বা রাতে আমি ইন্দ্রাদি দেবতার বধের কারণ হব না, তবেই আমি বন্ধুত্ব করতে পারি।"

ঋষিরা বললেন, "তাই হবে।" বৃত্রের সাথে বন্ধুত্ব করে ইন্দ্র চলে গেলেন।

একদিন ইন্দ্র সমুদ্রতীরে বৃত্রাসুরকে দেখতে পেলেন। ইন্দ্র ভাবলেন, এখন সন্ধ্যাকাল, দিনও নয় রাতও নয়। এই পর্বতাকার সমুদ্রফেনা শুকনোও নয় ভিজেও নয়, অস্ত্রও নয়। এই ভেবে ঠিক করে ইন্দ্র বৃত্রের উপরে বজ্রের সাথে সমুদ্রফেনা নিক্ষেপ করলেন। বিষ্ণু সেই ফেনায় প্রবেশ করে বৃত্রকে বধ করলেন। পূর্বে ত্রিশিরাকে বধ করে ইন্দ্র ব্রহ্মহত্যার পাপ করেছিলেন। আবার এখন মিথ্যাচার করে দুশ্চিন্তায় পড়লেন।

মহাদেবের ভূতরা ইন্দ্রকে বার বার ব্রহ্ম হত্যাকারী বলে লজ্জা দিতে লাগল। শেষ পর্যন্ত ইন্দ্র নিজের কু-কাজের জন্য অচেতনপ্রায় হয়ে জলের মধ্যে লুকিয়ে বাস করতে লাগলেন।

ইন্দ্রের অদৃশ্য হওয়ার ফলে পৃথিবী ধ্বংস হল। দেবতা ও মহর্ষিরা ব্যস্ত হয়ে ভাবতে লাগলেন, কে হবে আমাদের রাজা। কিন্তু কোনও দেবতা দেবরাজ হতে চাইলেন না।

শেষে দেবতারা ও মহর্ষিগণ তেজস্বী খ্যাতিমান ধার্মিক নহুষকে বললেন, "তুমিই দেবরাজ হও।" (চলবে)

শিবপুরাণ

ছয়

সায়ম্ভু মনুর কালে ষাট বছর বৃষ্টি না হওয়ার ফলে আকাল দেখা দিল। দেশ-বাসীর জীবন ভয়ঙ্কর রূপধারণ করল। এই মারাত্মক পরিস্থিতিতে চিন্তিত হয়ে ব্রহ্মা যোগ্য লোককে রাজা করতে চাইলেন। খোঁজ করলেন চারদিক। শেষে পেলেন। মনুবংশের রিপুঞ্জয় নামক লোককে ঠিক করলেন রাজা করবেন। কারণ রিপুঞ্জয় শান্ত এবং সৎ। রিপুঞ্জয়-কে ব্রহ্মা বললেন, "তোমাকে সমগ্র বিশ্বের ভার দেব। তুমি দিবোদাস নামে পৃথিবী শাসন কর। বাসুকীর কন্যা অনঙ্গ মোহিনী তোমার স্ত্রী হবে।"

এ কথায় রিপুঞ্জয় বলল, "দাদু, আপনি একটি বর দিলে আমি পৃথিবীর শাসনভার নিতে পারি। সেই বর হবে পৃথিবীতে উর্দ্ধলোকের অথবা পাতালের কেউ থাকতে পারবে না।"

ব্রহ্মা তাতে রাজী হয়ে এই কথা কাশীর বিশ্বেশ্বরকে জানালেন। বিশ্বেশ্বর ব্রহ্মার কথা মত কাজ করার পর রিপুঞ্জয়ের রাজ্যাভিষেক করিয়ে ব্রহ্মা নিজের লোকে চলে গেলেন। তারপর রিপুঞ্জয় দিবোদাস উপাধি ধারণ করে সারা পৃথিবীতে ঢাক পিটিয়ে জানিয়ে দিল যে পৃথিবীতে দেবতা অথবা পাতালবাসী কেউ থাকতে পারবে না।

এই ঢাক শুনে সারা পৃথিবীর দেবতারা ছুটে এলেন কাশী বিশ্বনাথের কাছে। তাঁদের বিশ্বনাথ বললেন, "ব্রহ্মা আমাকে আগে জানিয়েই দিবোদাসকে বর দিয়েছেন। আমরা সবাই মন্দর পর্বতে চল যাই।"

পৃথিবীর সমস্ত দেবতা চলে গেলেন।

শেষ প্রচ্ছদ চিত্র

সমস্ত মন্দিরে পূজা বন্ধ হয়ে গেল। তার-পর দিবোদাস কাশীকে রাজধানী করে টানা আট হাজার বছর শাসন করল।

পৃথিবী-ছাড়া হবার পর দেবতাদের কষ্টের সীমা ছিল না। তাঁরা তাঁদের গুরু বৃহস্পতিকে জিজ্ঞেস করল, "গুরু-দেব, দিবোদাসকে রাজ্যচ্যুত করার কোন উপায় বলে দিন।"

"অগ্নি, বায়ু ও বরুণতো আমাদেরই ভাই। ওরা নিজেদের শক্তি পৃথিবীতে প্রয়োগ না করলে পৃথিবীর অবস্থা একে-বারে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠবে। ভস্ম হয়ে যাবে।" বলল বৃহস্পতি।

কাশীতে কোথাও এক কণা আগুন ছিল না। রান্না হয়নি। খেতে কেউ পেল না। কিন্তু সূর্যের আলোর সাহায্যে দিবোদাসের জন্য রান্না হল। দেশবাসী কাতারে কাতারে এসে দিবোদাসের কাছে খাবারের জন্য কোলাহল করল। আসল ব্যাপার জেনে নিয়ে দিবোদাস বলল, "দেখ, এসব হল দেবতাদের বদমাইসী, তোমরা ঘাবড়ে যেয়ো না। আমি আমার তপস্যা বলে তোমাদের জন্য অগ্নি, বায়ু এবং বৃষ্টি দান করব।" দেশবাসীকে বুঝিয়ে দিয়ে ফেরত পাঠিয়ে দিল। তারপর যা বলেছিল তাই করল।

দেবতাদের ষড়যন্ত্র কার্যকরী হল না। দিবোদাসের পতনের জন্য শিবও ভাবতে লাগলেন। শেষে শিব চৌষট্টি জন সিদ্ধ যোগীনীদের ডেকে বললেন, "তোমরা কাশীতে গিয়ে স্ত্রীদের পাতিব্রত্য এবং পুরুষদের ধর্মবুদ্ধি নষ্ট কর। এছাড়া দিবোদাসের পতন ঘটানো যাবে না।"

সিদ্ধ যোগীনীরা শিবের কথামত কাজ করল। কিন্তু তারা সফল হতে পারল না। তারপর শিব সূর্যের কাছে গিয়ে বললেন, "তুমি কাশী গিয়ে যে কোন ভাবে দিবোদাসকে যাতে ধর্মচ্যুত কর।"

সূর্য নানান ধরণের পোষাক পরে কাশী ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। সূর্য আপ্রাণ চেষ্টা করলেন দিবোদাসকে

ধর্মচ্যুত করতে। কিন্তু দিবোদাসতো দূরের কথা তার কোন প্রজাও ধর্মচ্যুত হল না।

একেবারে বিফল হয়ে ফিরে যেতে সূর্যের ভাল লাগল না। তাই অগত্যা নিরুপায় হয়ে কাশীতে রয়ে গেলেন।

তারপর শিব ব্রহ্মাকে ডেকে বললেন, "আমি দিবোদাসকে ধর্মচ্যুত করাতে যোগীনীদের পাঠিয়েছিলাম। তাদের পরে সূর্যকে পাঠিয়েছি কিন্তু ওরা সবাই কাশী থেকে ফেরার নাম করছে না। ওখানেই রয়ে গেছে। এবার আপনি যান। তবে দয়া করে ওখানেই থেকে যাবেন না।"

ব্রহ্মা রাজী হয়ে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে কাশী গেলেন। দিবোদাসের দরবারে গিয়ে তাকে আশীর্ব্বাদ করে বললেন, "রাজা, তুমি রাজী হলে কাশীতে যজ্ঞ করব। তবে বিশ্বেশ্বরের অভাবে কাশীর শোভা দিনকে দিন কমে যাচ্ছে।"

শিবকে ডাকার ব্যাপারে দিবোদাস কোন কথা বলল না। ব্রহ্মা কাশীতে দশটি অশ্বমেধ যজ্ঞ করে নিজেও কাশীতে রয়ে গেলেন।

ব্রহ্মাও ফিরে আসছেন না দেখে শিব প্রমথদের কাশী পাঠালেন। কাশীর মাহাত্ম যে ঠিক কোথায় কে জানে। প্রমথরাও কাশী গিয়ে নিজেদের কর্তব্য

ভুলে গেল। তাদের মধ্যে কপর্দি নামক একজন কাশীতে কপর্দীশ্বর লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করলেন।

মন্দর পর্বতে অবস্থানকারী শিব কাশীর কোন খবর পেলেন না। দারুণ ভাবনায় পড়ে শিব ডেকে পাঠালেন গণেশকে। গনেশকে সব ঘটনা ভাল ভাবে বুঝিয়ে কাশী পাঠালেন।

গণেশ কাশী গিয়ে নানান ধরণের গোলমাল শুরু করলেন। তিনি ডুন্টি ভট্টারক নামে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতেন আর জ্যোতিষী বিদ্যায় পণ্ডিত হিসেবে নিজেকে প্রচার করতেন।

কাশীর ভবিষ্যৎ যে অন্ধকার তাও

তিনি প্রচার করতেন। তারপর একদিন দিবোদাসের দরবারে গেলেন। রাজার সমস্ত প্রশ্নের সঠিক সমাধান দিয়ে রাজার পুরোহিতদের মধ্যে একজন হিসেবে পরিগণিত হলেন।

দিবোদাস ডুন্ঠি ভট্টারককে প্রশ্ন করলেন, "কাশীতে গোলমাল হচ্ছে কেন?"

"মহারাজ, আমার মতে আপনার উচিত কিছুদিন কাশীনগর ছেড়ে দূরে চলে যাওয়া। আঠার দিন পরে উত্তর দেশ থেকে একজন ব্রাহ্মণ আসবেন। আপনাকে আরোও ভালো হিতোপদেশ দেবেন।" বললেন ডুন্টি ভট্টারক।

তারপর শিব বিষ্ণুকে কাশী পাঠালেন। বিষ্ণু বুদ্ধের রূপে কাশীতে এসে লোকের মধ্যে নাস্তিকতা বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম প্রচার করলেন।

তারপর তিনি ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ করে দিবোদাসের কাছে গিয়ে তাকে আশীর্বাদ করলেন। দিবোদাস তাঁকে বললেন, "হে মহাত্মা, দেবতারা আমাকে সরানোর জন্য অনেক চেষ্টা করছেন। আমিও বহু বছর শাসন করে এখন বৃদ্ধ হয়েছি। আমাকে দয়া করে জানান আমি কেমন করে মোক্ষ লাভ করব।"

"রাজা, তুমি যদি কাশীতে লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করতে পার তাহলে সশরীরে তুমি কৈলাস যেতে পারবে।" বিষ্ণু বললেন।

বিষ্ণুর পরামর্শ অনুসারে দিবোদাস পুত্র সমরঞ্জয়কে রাজ্যাভিষেক করালেন। এক বিরাট মন্দির তৈরি করিয়ে তাতে লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করালেন। তারপর এক বায়ুযান এল তাকে কৈলাশে নিয়ে যাওয়ার জন্য। দিবোদাস সেই বায়ুযানে করে কৈলাশে চলে গেল।

তারপর কাশী-ছাড়া সমস্ত দেবতারা আবার কাশী ফিরে এলেন। শিব নিজের বাহন নন্দীতে চড়ে নিজের প্রত্যেক গণকে নিয়ে কাশী ঘুরে ঘুরে দেখে অপার আনন্দ লাভ করলেন। (চলবে)

৬/'ট্রেবি ফাউন্টেন'

নিচের এই স্রোতস্বিনী রোম শহরে আছে। ঐ শহর থেকে যাওয়ার সময় এটাতে পয়সা কড়ি ফেললে আবার ঐ নগরে আসতে পারবে বলে লোকের বিশ্বাস। ঐ রেওয়াজের ফলে সেই স্রোতস্বিনীর জল যে সরোবরে পড়ে তাতে নেমে পয়সা কুড়োনোর ছেলের সংখ্যাও কম নয়। জলের উপর এক উড়ন্ত রথে বরুণদেব চিত্রিত আছে।

ফটো : এস. বি. তাকলকর

পুরস্কৃত
টীকা

আদরেতে কোলে উঠতে পারি

পুরস্কার পেলেন
[illegible]

ফটো : এস. বি. তাকলকর

৪৪৯ সার্কুলার রোড, ব্লক-৫
বোটানিক গার্ডেন, হাওড়া

আদরের জ্বালা সইতে নারি

পুরস্কৃত
টীকা

ফটো-পরিচিতি-টীকা প্রতিযোগিতা ঃঃ পুরস্কার ২০ টাকা

★ পরিচয়-টীকা বা নামকরণ ২০শে জানুয়ারী '৭৩-এর মধ্যে পৌঁছানো চাই।

★ পরিচয়-টীকা দু-চারটি শব্দের মধ্যে হওয়া চাই এবং দুটো ফটোর টীকার মধ্যে ছন্দগত মিল থাকা চাই। নিচের ঠিকানায় পোস্ট-কার্ডেই লিখে পাঠাতে হবে। পুরস্কৃত পরিচয় টীকা সহ বড় ফটো মার্চ '৭৩ সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

★ সফল পরিচয়-টীকা প্রতিযোগীর ঠিকানায় কুড়ি টাকা পাঠানো হবে।

চাঁদমামা

এই সংখ্যার কয়েকটি গল্প-সম্ভার

দ্বিতীয় প্রচ্ছদ চিত্র

চণ্ডীগড়ের সরোবর

তৃতীয় প্রচ্ছদ চিত্র

নৈনিতালের সরোবর

Printed by B. V. REDDI at The Prasad Process Private Ltd., and Published by B. VISWANATHA REDDI for Chandamama Publications, 2 & 3, Arcot Road, Madras-26. Controlling Editor: 'CHAKRAPANI'

আমাদের
সবার ভাল লাগে
চাঁদমামা
তোমারও লাগবে
ছোটবড় সবাই চাঁদমামা ভালবাসে।
পত্রিকাটি বেরোয়—ইংরেজী, হিন্দী, বাংলা, ওড়িয়া, মারাঠী, গুজরাটি, তামিল, তেলেগু, ক্যানারিজ আর মালয়ালম মোট দশটি ভাষায়!
মনভুলোনো ছবি আর গল্পেতে ঠাসা।
চাঁদমামা ছোটদের মাসিক পত্রিকা—
কত ছোট হবে বড় কত বড় ববে ছোট।
আজকেই চাঁদমামা কেনো।
গ্রাহক হবার জন্যে যোগাযোগ করুন : ডল্টন এজেন্সী, চাঁদমামা বিল্ডিং, মাদ্রাজ-২৬

Photo by: SURAJ N. SHARMA

শিবপুরাণ